ভ্রমণীয়

একটি সচলায়তন প্রকাশনা

www.sachalayatan.com

পহেলা বৈশাখ ১৪১৮

সম্পাদনা পরিষদ

মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

তৃষিয়া নাশতারান

নজরুল ইসলাম

ইমেইল: bastuharasachal@gmail.com

সম্পাদকীয়

রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছেন “কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে ভবঘুরে ধর্মের চেয়ে বড় আর কোনো ধর্ম পৃথিবীতে নেই”। প্রয়োজনে বাপের পকেট কেটে হলেও ভ্রমণ করতে হবে। বলেছেন “ভবঘুরের দল যদি আসা যাওয়া না করতেন তাহলে দুর্বল মানবজাতিগুলি ঘুমিয়ে থাকতো, পশুদের ছাড়িয়ে তারা ওপরে উঠতে পারত না।”

তাই আমরা ঘুরে বেড়াই। পাহাড় ডিঙাই আর সমুদ্র সাঁতরাই। অথবা কেবল মানুষ দেখি। কোনো দুর্গমতাই আটকে রাখতে পারে না আমাদের। নিত্যদিনের কর্মক্লান্ত জীবনে একটুকু অবসর পেলেই আমরা ক্লান্তিটুকু কাটাতে আরো ক্লান্তির পথে পা বাড়াই, ঘুরতে বের হই কোথাও।

আর ভবঘুরেমির যে আনন্দ, সে কি কেবল নিজে নিজে উপভোগ করলে চলে? সবাইকে মৌজ করে গল্পটা না বলতে পারলে আর মজা কোথায়? ঘুরাঘুরির গল্প শুনে পড়ে সবাই ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে ছাড়খাড় হয়ে যাবে তবেই না মজা। তাই ভ্রমণ কাহিনি লেখার প্রয়োজন আছে।

আর যারা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে নিজেরাও ভবঘুরেমির স্বাদ নিতে চায়, সিনিয়র ভবঘুরে হিসেবে তাদের তো পথটাও বাতলাতে হবে। সেজন্যও ভ্রমণ কাহিনি লিখে রাখার দরকার আছে।

সচলায়তনের লোকজন এমনিতেই একটু ঘুরনবাজ আছে। সুযোগ পেলেই বেয়াদবের মতো পাহাড়টাকে পায়ের তলায় রাখতে চায় যেন। তাই মনে হলো এত এত ভ্রমণবাজের লেখাগুলো একসঙ্গে জড়ো করে রাখতে পারলে তো বেশ হয়। যেই ভাবনা সেই কাজ।

তৈরি হয়ে গেলো সচলদের ভ্রমণ সংকলন- “ভ্রমণীয়”

সচল অমিত আহমেদের প্রস্তাবনায় পহেলা বৈশাখ এর ইবই হিসেবে এর যাত্রা শুরু। ইবইয়ের সুন্দর নামকরণটি সচল সুহান রিজওয়ানের।

অতি অল্প সময়ের নোটিশে এতগুলো অসাধারণ লেখা সংকলনের কপালে জুটবে এমনটা আশা ছিলো না। যারা লেখা দিয়েছেন, তাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অমিত আর সুহানকে। আর ধন্যবাদ সচল যাযাবর ব্যাকপ্যাকারকে। সবাইকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তিনি ঠিক লেখাগুলো আদায় করে নিয়েছেন।

আর ধন্যবাদ যারা পড়ছেন তাদের সবাইকে।

ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি লেখা প্রকাশ করা গেলো না। যাদের লেখা ছাপা গেলো না, তাদের প্রতি দুঃখপ্রকাশ করছি।

খুব অল্প সময়ে কাজটি করতে হয়েছে। কিছু ভুলত্রুটি থেকেই গেলো শেষ পর্যন্ত। সেজন্যও দুঃখটা রইলো।

অবশেষে সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

সম্পাদকমণ্ডলী

সূচিপত্র

নং	শিরোনাম	লেখক	পৃষ্ঠা
০১।	হুম, পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো শহর	আনিসুল হক	০৫
০২।	ঝর্ণা যেথায় বসত করে	দময়ন্তী	০৯
০৩।	কত কাণ্ড কক্সবাজারে	দ্রোহী	১৪
০৪।	নববর্ষে বার্লিনের পোস্টার-বালিকার	হাসিব মাহমুদ	২১
০৫।	বি আর হিলস, দস্যু বিরাপ্পন ও বাঘ মামা	শেখ জলিল	২৬
০৬।	পুণ্যভূমি	কৌস্তুভ	৩২
০৭।	মধুকাটা	মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	৩৮
০৮।	তিন বিঘা গ্রামে	নীড় সন্ধানী	৪২
০৯।	বিলাত যাত্রা, সকলের দোয়াপ্রার্থী	নৈষাদ	৪৮
১০।	চাইনিজ!	ফারহানা সুফি	৫২
১১।	প্রিয় দুর্গতিগাথা	রিসালাত বারী	৫৯
১২।	বার্বাডোস: ছন্দ, ঢেউ আর আনন্দের দেশে	ধ্রুব বর্ণন	৬৩
১৩।	সোনালি ডানার দিন	সুলতানা পারভীন শিমুল	৬৮
১৪।	সবুজ পাহাড়ের দেশে	অনুপম ত্রিবেদি	৭৩
১৫।	একটা দিন, মুন্সিগঞ্জে	ওডিন	৭৭
১৬।	ভ্রমণ- খিচুড়ি: আমেরিকার সেরা তিন	তাসনীম	৮৩
১৭।	আদিম অরণ্যের কাছাকাছি	রোমেল চৌধুরী	৮৮

হুম, পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো শহর

আনিসুল হক

আমরা অনেকেই অনেক অনেক দেশ ঘুরি। বড়ো বড়ো শহর দেখি, প্রকৃতির বিশাল ঐশ্বর্যের মাঝে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিজেকে হারিয়ে অনেক সময়ে নিজেকেই খুঁজে পাবার পথ হাতড়াই। কখনো কখনো পুরোনো স্থাপত্যশিল্পের রূপ আর রসে সিক্ত করে নিজেকে উজ্জীবিত করি। নতুন কোনো নির্মাণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনেকের চাইতে ভাগ্যবান ভাবি। কিন্তু পৃথিবীর ছোটো শহরটি দেখেছেন কেউ? আমার সে সৌভাগ্য হয়েছে।

ক্রোয়েশিয়ায় শহরটির নাম 'হুম'। গিনেস বইয়ের তথ্যানুসারে এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো শহর। সরকারি হিসেব অনুযায়ী এই শহরের অধিবাসীর সংখ্যা তেইশ। এটিকে কি শহর বলা যায়? হুমের অধিবাসীদের দাবি অনুযায়ী অবশ্যই এটি একটি শহর। একজন মেয়র ও একজন পাদরি ও একটি রেস্টুরেন্ট যেখানে আছে, সেটি শহর নয়তো কী? অন্যান্য শহরের মতো এখানেও পাঁচ বছর পরপর একজন মেয়র নির্বাচন করা হয়, যদিও খুব অদ্ভুত এই নির্বাচনপদ্ধতি। যারা নির্বাচিত হতে চান, তারা একটি কাঠের ফলকে নিজের নাম লিখে অধিবাসীদের হাতে তুলে দেন। অধিবাসীরা যাকে পছন্দ করেন, তার ফলকের গায়ে খোদাই করে দাগ কেটে নিজেদের পছন্দ জানায়। যার ফলকে বেশি দাগ, হুমের নির্বাচিত মেয়র হবার যোগ্যতা তার কপালেই জোটে।

দুই সপ্তাহের জন্যে সমুদ্রস্নান আর বিশ্রাম, এর ফাঁকে ফাঁকে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানোর জন্যে এসেছি ক্রোয়েশিয়ার ইসট্রিয়া প্রদেশে। জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপিয়ান ট্যুরিস্টদের জন্যে ক্রোয়েশিয়ার সমুদ্রতটকে তীর্থস্থান বললে ভুল হবে না একেবারেই। যদিও টিটোর সমাজবাদী শাসন ও যুগোস্লাভিয়ার একক অস্তিত্বকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে দেশটি এখন পুঁজিবাদের পুজারি, তারপরও আগের মতোই যারা সুলভে ছুটি কাটাতে চান, তাদের অনেকেই এখানে আসেন। যদিও হোটেল, বাংলো, খাবারদাবারের দাম প্রতিবছরই একটু একটু করে বেড়েই চলেছে, তারপরও সেটি ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটাই কম। তবে দেশটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য হলে সে পার্থক্যটুকু আর থাকবে বলে মনে হয় না।

আড্রিয়াটিক সমুদ্রের এপারে অনেকগুলো দ্বীপ নিয়ে ক্রোয়েশিয়া, আর ওপারে ও সামান্য স্লোভেনিয়ার এলাকা পেরিয়েই ইতালি। সেকারণেই ইসট্রিয়াতে ইতালিয়ান প্রভাব প্রবল। আবহাওয়া ও পরিবেশে তারতম্য বিশেষ নেই। ঘরবাড়ির গড়নগঠন, খাবারদাবারেও ইতালিয়ান প্রভাব ঢের পাওয়া যায়। প্রতিটি শহর ও গ্রামে গাড়ি নিয়ে ঢোকার ও বেরুনোর পথে সাইনবোর্ডে সেটির ক্রোয়েশিয়ান ও ইতালিয়ান নাম লেখা রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য বা বা অন্য কোনো কারণেই হোক না কেন, পূর্বইউরোপীয় অধিবাসীদের দৈনন্দিন চলাফেরায় যে জড়তা রয়েছে, সেটির তুলনায় ইতালিয়ান জীবনধারণ, আবহ আর প্রাণচাঞ্চল্য ইউরোপিয়ান ট্যুরিস্টদের টানে বেশি। আর সেটি যদি কিছুটা সুলভে ভোগ করা যায়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। ক্রোয়েশিয়ার এই ইসট্রিয়া এলাকার বেলাতেই সেটিই হয়েছে। তারপর রয়েছে নগ্নতাবাদীদের জন্যে আলাদা করে দেওয়া বেলাভূমি। ইউরোপের অন্য কোনো দেশে এ ধরনের এত বেলাভূমি আছে কি না জানা নেই। তবে এটি পুঁজিবাদের কোনো প্রভাব নয়, টিটোর যুগোস্লাভিয়া হিসেবেও ক্রোয়েশিয়ার এই এলাকা একই কারণে আকর্ষণীয় ছিলো।

ইসট্রিয়াতে আমাদের দুটো সপ্তাহ বেশ ভালোই কাটলো। শনিবার সকালে বাক্সপেটরা বেঁধে রওয়ানা হলাম মিউনিখের পথে। তবে যে পথে এসেছি, সরাসরি সে পথে বাড়ি ফেরার ট্যুরিস্ট আমরা একেবারেই নই। তাই আড্রিয়াটিক সমুদ্রতট ছেড়ে ইসট্রিয়ার আরো ভেতরে ঢুকে পাহাড়ি চড়াই-উতরাই পেরিয়ে স্লোভেনিয়া আর ইতালির পর্বতমালা পেরিয়ে জার্মানিতে ঢোকার সবচেয়ে কঠিন পথটিই বেছে নিলাম। হাইওয়ে ধরে হুহু করে এগিয়ে যাওয়া নয়, ছোটো ছোটো রাস্তা ধরে ছোটোবড়ো শহরের পাশ ঘেঁষে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে নিজেদের গন্তব্যের পথে পা বাড়ানো। কখনো কোথাও থেমে খাওয়াদাওয়া বা এক কাপ কফি হাতে নতুনের দিকে তাকিয়ে থাকা। আমি চালকের আসনে ও বউ ম্যাপ আর বই হাতে নতুন কোনো দর্শনীয় স্থান খোঁজায় ব্যস্ত। সাথে সাহায্যকারী হিসেবে রয়েছে আমাদের নেভিগেশন-যন্ত্র।

বই আর ম্যাপ থেকে চোখ তুলে হুমে যাবো কি না, জানতে চাইলো বউ। হুম কী, জানতে চাইলাম। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো শহর, জানালো সে। সাথে সাথেই রাস্তার পাশে ছোটো একটি জায়গা পেয়েই থামালাম গাড়ি। ম্যাপের পাতায় চোখ বুলিয়ে দেখলাম, হুমে ঢোকার রাস্তা পেরিয়ে প্রায় কুড়ি কিলোমিটারের মতো এগিয়ে এসেছি আমরা। কিন্তু তাতে কী? এসব প্রশ্নে আমাদের কোনো মতপার্থক্য কখনোই নেই। নেভিগেশনে খুঁজে ঠিকঠাক করেই গাড়ি ঘুরিয়েই ছোটালাম উলটো পথে।

হুমে ঢোকার পথ খুঁজে পাওয়া খুব সহজ হলো না। নেভিগেশনের যেখানে দেখালো সেখানে রাস্তাই পেলাম না। হয়তো আমার আপডেট করা ম্যাপ নেই সে যন্ত্রে। এখানকার শহর বন্দর আর রাস্তাঘাটের পরিবর্তন খুব দ্রুত। হয়তো সেই প্যাঁচেই আমাদের এই বিড়ম্বনা। সে যা-ই হোক, তার আরো বেশ আগে খুব ছোটো একটি রাস্তা বেরিয়ে গেছে ডানে। কয়েকবার এদিক সেদিক ঘোরার পর সেখানে বেশ পুরোনো, রোদ আর বৃষ্টিতে প্রায় মুছে যাওয়া একটি সাইনবোর্ড হুমের নির্দেশ দেখা গেলো।

হুমের নামফলক

মূল রাস্তা থেকে বেশ খাড়াভাবে নেমে এগিয়ে গেছে রাস্তাটি। আর কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর সেটি এত বেশিই ভাঙাচোরা যে, নিজেরাই সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলাম। তবে আরো কিছুদূর এগিয়ে আরেকটি সাইনবোর্ড দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। এর পর আরো প্রায় চব্বিশ কিলোমিটারের পথ হুম। গহন প্রকৃতির মাঝে প্রায় ফাঁকা এই পথ। দুই পাশে বিশাল জঙ্গল ছাড়া আরো কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে মনে হলো না। মাঝে মাঝে একটি দুটো গাড়ি আসছে উলটো দিক থেকে। তখন পাশ কাটানোই কঠিন হয়ে পড়ে।

হুমের বাড়ি

ছোটো একটি টিলার উপর পড়ে উঠেছে হুম। তার পাশে একটি নির্ধারিত পার্কিং- এ আমরাও থামলাম। আশেপাশে আরো গোটাপাঁচেক গাড়ির পাশে একটি বাসও দেখতে পেলাম। তাতে হুমের অধিবাসীর চাইতে দর্শনার্থীর সংখ্যা যে ছাড়িয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ রইলো না। শহরের দিকে তাকাতেই প্রথমে গির্জাটি চোখে পড়লো। বেশ ছিমছাম আকারের একটি দালানের ভেতর থেকে উপরে উঠেছে চুড়ো। তার পাশেই টাউন হল। চারদিকে তাকিয়ে আমাদের পাশের একটি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা একজন মহিলা ছাড়া কাউকেই দেখতে পেলাম না। বাসের ভেতরটিও একেবারেই ফাঁকা।

হুমের রাজার বাড়ি

হুমের গোড়াপত্তন আরো আগে হলেও বর্তমান চেহারা নিয়ে শহরটির আত্মপ্রকাশ ঘটে ১১শ শতাব্দীতে। সে সময়েই শহরের প্রতিরক্ষাদেওয়ালের অবশিষ্ট পাথরে এখানকার দুর্গ ও প্রাসাদ গড়া হয়। তার পাশেই গড়ে ওঠে শহরের প্রথম বসতবাটী। তখন ফরাসিদের দখলে ছিলো হুম। ১১০২ সালে শহর হিসেবে স্বীকৃতি পায় হুম। ১২শ ও ১৫শ শতাব্দীতে আর আগের চেহারা অক্ষত রেখে নতুন করে গড়া হয় শহরটি।সেসময়েই শিল্পকর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। নামিদামি শিল্পীকে এনে গির্জার দেয়ালে ছবি আঁকানো হয়। ১৪১২ সালে ভেনিসের রাজার দখলে আসে হুম। দখলের আগে প্রতিরক্ষা দেওয়ালটি ধ্বংস করে ভেনিসের সৈন্যরা। ১৬শ ও ১৭শ

শতাব্দীতে আবার গড়া হয় প্রতিরক্ষা দেওয়াল। দেয়ালেও দুটো চুড়ো গড়া হয় সে সময়ে। এই স্লাভীয় এলাকায় গ্লাগোনিসা নামে অক্ষরের ব্যবহার ছিলো তখন। ঊনবিংশ শতাব্দী প্রথম দিকেও হুমের আশেপাশে এই অক্ষরে লেখালেখি করা হতো। রাজবাড়ি, গির্জা ও শহরের বিভিন্ন দেওয়ালে সে অক্ষর দেখতে পাওয়া যায়।

হুমের প্রবেশদ্বারে গ্লাগোনিসা অক্ষরে

হুমের রেস্টুরেন্ট

বসতবাটীর পাশ ঘেঁষে ঘোরাফেরা সময় একজন দুজন ট্যুরিস্ট দেখতে পেলেও কয়েকটি বিড়াল ছাড়া হুমের অধিবাসীদের কাউকে দেখলাম বলে মনে হলো না। বাসের যাত্রীদেরকেও দেখলাম না। রাজপ্রাসাদ আর গির্জার দরজাও বন্ধ। তবে ট্যুরিস্টদের জন্যে কিছু অংশ খোলা রেখেছে হুম কর্তৃপক্ষ। সেগুলোতে ঢুঁ মেরে বসলাম হুমের একমাত্র রেস্টুরেন্টে। সেখানেই এখানকার অধিবাসীদের কাউকে দেখতে পেলাম। সেখানে হালকা খাবার ও কফির পর্ব শেষ করে আবার বেরিয়ে পড়লাম মিউনিখের পথে।

ঝর্ণা যেথায় বসত করে

দময়ন্তী

মাইকের অত্যাচারে আর আনন্দের ওভারডোজে পুজোর সময় কলকাতা বা আশেপাশে থাকা যাবে না বলে পুজোর দুমাস আগে থেকেই হন্যে হয়ে বেড়ানোর প্ল্যান শুরু করেছিলাম। এখান ওখান সেখান করতে করতে সিকিম ফাইনাল হলো। বন্ধু অরিজিৎও সুমনা, ঋক, ঋতিকে নিয়ে যাচ্ছে, একই সময় গেলে একসাথে হইহল্লা করতে করতে যাওয়াও হবে আর গাড়িভাড়াও শেয়ার করা যাবে। এইসব সাতপাঁচ ভেবেটেবে ঠিক হলো উত্তর সিকিম আমরা একসাথে 'ফর্চুনা রেসর্টসের প্যাকেজে ঘুরবো, আর বাকিটা যে যার মতো।

আমরা যেদিন উত্তর সিকিমের দিকে রওনা হবো, সেটা বিজয়া দশমী অর্থাৎ 'দসেরা'। সিকিমে মূলত হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের লোকের বসবাস। 'দসেরা' নেপালি ও সিকিমিজ হিন্দুদের বেশ বড়ো উৎসব। অধিকাংশ লোকজন পাঁচ থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি বসে রয়েছে। ফর্চুনার অধিকাংশ ড্রাইভারও ছুটিতে। ফলে তারা এদিক ওদিক থেকে একজন বৌদ্ধ ড্রাইভার জোগাড় করে আমাদের পিক-আপের জন্য পাঠালো। অতএব সকাল দশটায় যে যাত্রা শুরু হওয়ার কথা, তা শুরু হলো বেলা পৌনে বারোটায়। এবং গ্যাংটকের সীমা ছাড়িয়ে অল্প একটু উঁচুতে উঠতেই বোঝা গেলো 'উত্তর সিকিম' যাবো শুনেই গ্যাংটকের লোক কেন বিরস মুখে তাকাত। এমনিতে সিকিমিজরা বেশ হাসিখুশি ধরনের লোক, কিন্তু ঐ উত্তর সিকিম শুনলেই কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ত। রাস্তা অসম্ভব খারাপ, প্রায় নেই বললেই চলে। অরিজিৎ নাম দিয়েছিলো 'নেই-রাস্তা'। সত্যিই তাই। পাসাং, মানে আমাদের ড্রাইভার খানিকটা গিয়েই বিড়বিড় করে বলতে শুরু করলো 'ইয়ে কাঁহা ফাঁসায়া মেরেকো', আবার আমাদের বলে তোমরা জানো তো কোথায় কোথায় যাবে? আমি ঠিক নিয়ে যাবো। এদিকে রাস্তায় অনেকখানি গভীর গাড্ডা, এমন কাদা আর এত ভাঙা যে গাড়ি এগোতে লাগলো পা টিপে টিপে, দুলে দুলে, ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে; ওদিকে পাসাং-এর দেখি মুখ শুকিয়ে গেছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেলো যে ও এইদিকে কক্ষনো আসেনি, গ্যাংটক-শিলিগুড়ি রুটে ট্রাক চালায়। ওকে ওর মালিক জোর করে ফর্চুনার কাছে পাঠিয়েছে এই ট্রিপটা খেটে দেওয়ার জন্য। নয় হাজার টাকা আর ডিজেলের দাম পাবে ও। খাওয়া দাওয়া তো ট্যুরিস্টরা যেখানে খাবে সেখানেই ওর ফ্রি। পাসাং যেহেতু এদিকে কোনোদিন আসেনি, তাই ফর্চুনার অন্য একটা গাড়িকে ওর অনুসরণ করার কথা, ওদিকে সেভেন সিস্টার্স ফলসের পরেই সে ড্রাইভার তার জিপ নিয়ে কোথায় হাওয়া। পাসাং বেচারা ঐ নেই-রাস্তায় যত জোরে যাওয়া সম্ভব তত জোরেই ছোটালো অগ্রবর্তী জিপকে ধরার জন্য।

আমাদের দুপুরে খাওয়ার কথা ছিলো ফোডোঙে, কিন্তু সেই জিপের খোঁজে ছুটতে গিয়ে আমরা সেসব পিছনে ফেলে এসেছি। সামনে একটা 'ঘাট' যার দুদিকেই গাড়ির কাতার। 'ঘাট' অর্থাৎ কিনা সেখান দিয়ে একটি মাত্র গাড়িই যেতে পারে। তাই দুদিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এক এক করে গাড়ি পার করানো হচ্ছে। প্রথম আধঘন্টা উপর থেকে নেমে আসা গাড়িগুলো ছাড়া হবে, পরবর্তী আধঘন্টা নিচের গাড়িগুলো উপরে যাবে। সেই জায়গাটা ভয়ানক। ফুটখানেক গভীর কাদা আর এদিকে পাহাড়ের একটা পাথর রাস্তার প্রায় উপরে এতটাই ঝুলে রয়েছে যে সেখান দিয়ে ছোটো ট্রাক যেতে পারলেও বড়োসড়ো পাঞ্জাব লরি যেতে পারবে না। আবার এদিকে প্রায় চুলের কাঁটাসম একটি বাঁকও আছে। পুরো জায়গাটা একবারে পেরোতে হবে, আটকে গেলেই সর্বনাশ!

তা, ব্যাপারস্যাপার দেখে আমরা সেখানেই দুপুরের খাবার খেয়ে নেওয়া স্থির করলাম। এখানে সেই অগ্রবর্তী গাড়িরও দেখা পাওয়া গেলো। ধীরে ধীরে সেই জায়গা পেরোনোও গেলো নিরাপদে। আমাদের আজকের গন্তব্য লাচেন। চুংথাং থেকে রাস্তাটা দুইভাগ হয়, একদিকে লাচেন-চু নদীর সঙ্গে গিয়ে পৌঁছতে হয় লাচেন এবং সেখান থেকে আরও ওপরে গুরুদোংমার হ্রদ। আরেকদিকে লাচুং-চু নদী পাশে পাশে কলকল বকরবোকর করতে করতে পৌঁছে দেয় লাচুং এবং সেখান থেকে ইয়ুমথাং ভ্যালি, জিরো পয়েন্ট ইত্যাদি।

তা, আমরা তো লাচেন-চুয়ের দেখানো রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলাম। এদিকে কোথাও কোথাও কিশোরী ঝর্ণারা হু-উ-ই উঁচু থেকে লাফিয়ে নেমে দিব্যি রাস্তার ওপর দিয়েই খলবলিয়ে বয়ে গিয়ে আবার খাদে ঝাঁপ দিচ্ছে, আরও নিচে হয়তো কোনো রাস্তাকে এমনি করেই ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে কে জানে কোথায় বয়ে চলে যাচ্ছে। হয়তো আরও নিচে গিয়ে অনেক লোকজন দেখে হয়তো একটু লজ্জা পেয়ে নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই রাস্তা অথবা নেই-রাস্তা দিয়ে চললো আমাদের গাড়ি। চুংথাং পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেশ অন্ধকার হয়ে গেলো। অতঃপর হেডলাইটের আলো সম্বল করে বাঁইবাঁই করে বাঁক ঘুরে ঘুরে আমরা লাচেনের দিকে উঠতে লাগলাম। কিছুদূর ওঠার পর আরেক বিপত্তি। সামনের একটি গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। হিমালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, রাস্তায় কোনো গাড়ি খারাপ হলে, পাশে যতই জায়গা থাকুক অথবা রাত্তির হয়ে যাক, বাকি গাড়িগুলো কক্ষনো ঐ গাড়িকে একা রেখে সামনে এগিয়ে যাবে না। ফলে পরপর বারো তেরোটা গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে; সব ড্রাইভারই চেষ্টা করছে খারাপ হয়ে যাওয়া গাড়িটাকে সাহায্য করতে। অবশেষে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বারো তেরোটা গাড়ির এক লম্বা মিছিলো নিয়ে আমরা লাচেনে পৌঁছোলাম।

পথে মাঝেমধ্যে ঘুমভাঙা চোখে লোকজন বারান্দায় এসে আমাদের মিছিলো লক্ষ্য করছিলো। পাহাড়ি জায়গায় লোক সূর্যের সাথে জাগে আর সূর্যের সাথেই ঘুমায়। রাত সাড়ে আটটা সেখানে প্রায় মাঝরাত।

পরেরদিন ভোর ছটায় উঠে রওনা দিলাম গুরুদোংমার হ্রদের দিকে। হিমালয়ের একটা নিয়ম হলো আকাশে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করে বেলা বারোটার মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে হয়, কারণ অনেকসময়ই বারোটার পরে আবহাওয়া খুব খামখেয়ালি হয়ে যায়। গুরুদোংমার হ্রদের উচ্চতা ১৭,০০০ ফুট। এর মধ্যে শেষ দুই কিলোমিটারে প্রায় দুই হাজার ফুট উঠতে হয়, ফলে অত্যন্ত সুস্থ লোকেরও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। শীতের দিনে রাস্তা সম্পূর্ণ জমে গেলে গাড়ির চাকায় চেইন বেঁধে টেনে শেষ দুই কিলোমিটার তোলা হয়। এই সব রাস্তায় যাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ট্রেক করে যাওয়া, তাতে মানবদেহ পরিবেশের সাথে ধীরে ধীরে সইয়ে নেয়। আমরা যেহেতু একবারে প্রায় সাত আট হাজার ফুট উঠে যাবো, তাই সঙ্গে পর্যাপ্ত চকোলেট, পপকর্ন ইত্যাদি নেওয়া হয়েছে। সুয্যিমামা যখন আকাশের সবচেয়ে কাছের পাহাড়চূড়ায় গুড মর্নিং কিস দিচ্ছেন, ততক্ষণে আমরা হাজার দুয়েক ফুট উঠে গেছি। তারপর শুরু হলো আমাদের সাথে বরফচূড়াদের লুকোচুরি খেলা। কখনও তারা বাঁদিকের পাহাড়ের মাথা থেকে টুকি করে- সুমনা উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, কখনও বা সামনের ডানদিক থেকে বরফঢাকা নাকটা দেখিয়েই আমাকে ক্যামেরা তাক করতে দেখে লুকিয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে তৃণরেখা শেষ হয়ে গেলো। কোথাও কোথাও তৃণরেখার সামান্য ওপরেই বরফরেখা শুরু হয়ে গেছে, কোথাও বা আবার ঘাস শেষ হওয়ার পর বেশ খানিকটা উদোম পাহাড়, তারপর শুরু হয়েছে বরফ, রোদ্দুর পড়ে তা কখনও সোনা, কখনও বা রূপোর রঙ ধরছে। আস্তে আস্তে বাতাস পাতলা হতে শুরু করলো, রাস্তার পাশে একটু উপরে বা নিচে তাকালেই বরফ শুধু বরফ। আর যখন দুই কিলোমিটার বাকি, তখনই

মূর্তিমান রসভঙ্গকারী হয়ে এক মিলিটারিম্যানের আবির্ভাব। ঋতির বয়স পাঁচ পেরোয়নি, কাজেই তাকে গুরুদোংমারের দিকে নেওয়া যাবে না আর নেওয়া নিরাপদও হবে না; কারণ অসুস্থ হলেও ধারেকাছে উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত নেই। চার পাঁচ হাজার ফুট নেমে গেলে তবেই পাওয়া যাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা, এখানে শুধু প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এসব শোনার পর আর কে-ই বা সাহস করে বাচ্চা নিয়ে যাবে। তবু আমি আর অরিজিৎ মিলে চেষ্টা করেছিলাম একটা বা দুটো গাড়িতে করে বাচ্চাদের ও তাদের মায়েদের নিচে পাঠিয়ে আর একটা গাড়ি নিয়ে হ্রদের ধার অবধি যেতে। ঐ সাড়ে পনেরো হাজার ফুট উচ্চতায়ও আমাদের কোনোও অসুবিধে হচ্ছিলো না।

কিন্তু হায় অন্য গাড়িগুলোর লোকজন খুবই ভয় পেয়েছে, কেউ যেতে রাজি নয়। টিপিক্যাল বাঙালি ট্যুরিস্ট! অগত্যা মন খারাপ করে ফেরত এলাম।

এখানে কয়েকটা নিয়ম উল্লেখ করে রাখি।

১) ভারতীয় নাগরিক না হলে লেক গুরুদোংমারে যেতে অনুমতি দেওয়া হয় না, লাচেন থেকে ফেরত আসতে হয়।

২) গোটা সিকিমে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ। সিকিম ট্যুরিজমের পক্ষ থেকে গুরুদোংমারের মতো অতি উচ্চ ও দুর্গম স্থানে প্লাস্টিক ব্যাগ না বহন করতে অনুরোধ করা হয়।

৩) সিকিমে গুটখা বা তামাকমেশানো পানমশলা বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা আছে এবং তা কঠোরভাবে পালনও করা হয়। ফলে রাস্তায়ঘাটে লোকে থু থু করছে, এই দৃশ্য একেবারেই দেখা যায় না।

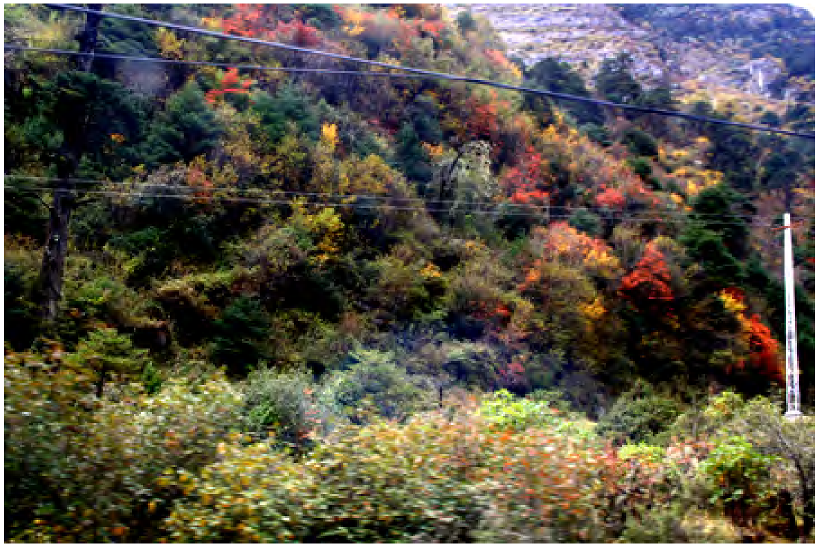

ফেরার সময় থাঙ্গু থেকে চোপতা ভ্যালি দেখে এলাম। লাচেন-চু নদীর পাশে এক মার্শল্যান্ড। আর দেখলাম গাছেদের রঙবদল, যাকে বলা যায় ইন্ডিয়ান ফল কালারস। গুরুদোংমার তো যাবোই, উত্তর সিকিমেই আবার যাবো। এ এমন জায়গা যা প্রতিটা ঋতুতে অন্যরকম হয়। অজস্র ঝর্ণা আর নদীর গর্জন গোটা সিকিম ভ্রমণকালে ছিলো আমাদের সঙ্গী।

হয় লাচেন-চু নয় লাচুং-চু, নয় রঙপো, নয় রঙ্গীত আর নয়ত তিস্তা- কেউ না কেউ সবসময় আমাদের সাথী ছিলো, আর ছিলো নাম জানা, না জানা ঝর্ণারা, গভীর সবুজ গাছ গাছালি আর তীব্রস্বরে গর্জনকারী ঝিঁঝিঁপোকার দল।

রডোডেনড্রনের বনের মধ্যে দিয়ে লাচুং-চু নদীর কোলে ইয়ুমথাং ভ্যালি, সেই যেখানে গাছশুমারির পর গাছবাবুরা লিখে রেখে যায় রডোডেনড্রন গাছেদের সংখ্যা, তাদের ছানাপোনাদের খবর, সেই যেখানে নদীর বুকে পাথরের ওপরে লাল টুকটুকে শ্যাওলা গজায় আর রিভারবেড লালে লাল হয়ে থাকে, সেসব গল্প নাহয় আরেকদিন করবো।

কত কাণ্ড কক্সবাজারে!

দ্রোহী

ভ্রমণ বিষয়টা বাঙালির ধাতে সয় না। শুনেছি বিয়ের পর বাসর ঘরের ফুল শুকিয়ে যাবার আগেই নবদম্পতিকে মধুচন্দ্রিমা উদযাপনে বের হতে হয়। ঘরকুনো বাঙালিও এ ব্যাপারে খুব একটা পিছিয়ে নেই। আমি বাঙালি হিসাবে নিকৃষ্টতম তাই বিয়ের দুই মাস পার হয়ে যাবার পরও "ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু" দেখবার কোনো সদিচ্ছা জাগেনি মনে।

অবশেষে আড়াই মাস পর টনক নড়ে। আটপৌরে মধুচন্দ্রিমা উদযাপনে বেজায় আপত্তি আমার। বাঙালি দম্পতি হানিমুনে কক্সবাজার গিয়ে 'সাগরের হানির ভেতর মুনের প্রতিফলন' দেখে হানিমুন পালন করে। পয়সা খরচ করে এ ধরনের অর্থহীন কাজের কোনো মানে হয় না। তাই কক্সবাজার পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ে। আমরা সিদ্ধান্ত নেই- আমাদের মধুচন্দ্রিমা হবে বান্দরবানে। বাসে করে প্রথমে চট্টগ্রাম, সেখান থেকে বাস বদলে বান্দরবান। তারপর ট্রেকিং- গন্তব্য বগা লেক। বান্দরবানে দুই- তিনদিন কাটিয়ে অতঃপর কক্সবাজার।

আমার দৌড় বান্দরবানের চিম্বুক অব্দি। বগা লেক কেবল ছবিতেই দেখেছি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সুপরিচিত জুনিয়রকে গাঁটের পয়সা খরচ করে সাথে নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম 'বগা লেক এক্সপার্ট' হিসাবে। সে এর আগে বান্দরবান থেকে ট্রেকিং করে বগা লেকে গেছে চার- পাঁচবার। তাছাড়া বান্দরবানের স্থানীয় প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তির সাথে তার ভালো জানাশোনা আছে। তাছাড়া সে সাথে থাকলে নিরাপত্তার বিষয়টাও বেশ পোক্ত হয়। এক্সপার্টের পরামর্শ মোতাবেক ঢাকা- চট্টগ্রাম গ্রীণ লাইনের টিকেট কেটে ফেললাম। চট্টগ্রাম থেকে কীভাবে বান্দরবান যাবো তা জানতে চাইলে এক্সপার্ট বললো, 'পানি নিয়ে ভাবনা আর না, আর না। পেডরোলো পাম্প আছে আর নেই ভাবনা।' সে বললো, বান্দরবানে থাকার জায়গা, ট্রেকিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও সাথে যাবার জন্য দুয়েকজন স্থানীয় লোক ইত্যাদির জোগাড়যন্ত্র করা দুই আঙুলে তুড়ি বাজানোর মতো সহজ কাজ!

দিনটা ছিলো ২০০৬ সালের জুন মাসের ১৯ তারিখ। আমাদের বাস রাত ১০টায়। ছাড়বে পান্থপথ- শুক্রাবাদ মোড় থেকে। বাস ঢাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর শুরু হলো নরকযন্ত্রণা। টিভিতে একের পর এক সস্তা ভাঁড়ামো ভরা নাটক চলতে শুরু করলো। টিভি জিনিসটা আমার ভয়াবহ অপছন্দের। শুধুমাত্র খেলা আর সিনেমা দেখা ছাড়া আমার জীবনে টিভির কোনো প্রভাব নেই। ঘুমে- নাটকে- জাগরণে কেটে গেলো যন্ত্রণাকাতর আধা রাত। ভোররাতের দিকে টিভি বন্ধ করার পর ঠাসবুনোট ঘুম লাগালাম সকাল অব্দি। ঘুম ভাঙার পর দেখি বাস পৌঁছে গেছে চট্টগ্রাম। তখন ভোর ছয়টা।

বাস থেকে নেমে সিএনজিওয়ালাদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম বান্দরবানের বাস ছাড়বে সকাল দশটার দিকে। বাসের জন্য চার ঘন্টা অপেক্ষা করার চাইতে হেঁটে বান্দরবান চলে যাওয়া উত্তম কাজ। তাই সিদ্ধান্ত বদলাতে সময় লাগলো কয়েক মিনিট। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো আমরা সারাদিনের চুক্তিতে একটা সিএনজি ভাড়া করে ফেলেছি। চুক্তি মোতাবেক সিএনজি আমাদের চট্টগ্রাম থেকে রাঙামাটি নিয়ে যাবে। সেখানে চাকমা রাজার বাড়ি, বৌদ্ধবিহার, কাপ্তাই লেক,

শুভলং ঝর্ণা, পেদা টিং টিং ইত্যাদি ঘুরিয়ে পুনরায় চট্টগ্রামে ফিরিয়ে এনে বান্দরবানের বাসে তুলে দেবে।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার ভেতর দিয়ে যাত্রা শুরু হলো। সাথে থাকা স্যুটকেসের জায়গা হলো সিটের পেছনের বাড়তি অংশটুকুতে। আমি ও গাইড দুজনে দুটো পেল্লায় ব্যাকপ্যাক কোলে চড়িয়ে বসলাম। সিএনজি চট্টগ্রামের পথ ছাড়িয়ে রাঙামাটির পথে পড়া মাত্র শুরু হলো নতুন যন্ত্রণা। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে সিএনজি উপরে উঠতে পারে না। ঢালের মুখোমুখি এসে আমরা খালি সিএনজি ঠেলে ঠেলে উপরে উঠাই। তারপর সিএনজিতে চড়ে বসি। ঢাল গড়িয়ে যাত্রীবোঝাই সিএনজি তীরবেগে নিচে নামতে থাকতে রোলার কোস্টার রাইডের মতো। এভাবেই চড়াই- উতরাই ডিঙিয়ে চলতে লাগলাম সারাটা পথ।

রাঙামাটি পৌঁছে প্রথম গেলাম শহরের রাজদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী চাকমা রাজার বাড়ি দেখতে। বাড়িটির মালিক রাঙামাটির চাকমা সার্কেল চিফ রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়। ষাটের দশকে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজে কাপ্তাই বাঁধ তৈরি হলে রাঙামাটি শহর ডুবে গেলে নতুন করে এই ছোট্ট দ্বীপটিতে বাড়িটি তৈরি করা হয়। তখন থেকেই দ্বীপটির নাম হয় রাজদ্বীপ। খেয়া পার হয়ে রাজদ্বীপে নেমে বাঁশবাগানের ভেতর দিয়ে খানিকটা হাঁটলে চাকমা রাজার বাড়ি। রাজবাড়ির সামনে গিয়ে দেখি কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরি খুব সাধারণ একটা বাড়ি! বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবারগুলোর বাড়ি দেখতে প্রায় একই ধরনের হয়ে থাকে। বাড়ির সামনে সাইনবোর্ড লাগানো না থাকলে বাড়িটি যে রাজবাড়ি তা বোঝার কোনো উপায় নেই। পরবর্তীতে খবরের কাগজ পড়ে জেনেছিলাম বাড়িটি গত ১০ নভেম্বর ২০১০ সন্ধ্যায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

চাকমা রাজার বাড়ি দেখা শেষ করে পুনরায় খেয়া পাড়ি দিয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে উঠলাম। এবার গন্তব্য রাজবন বৌদ্ধবিহার। বৌদ্ধবিহারকে স্থানীয়রা বলে কিয়াং। বৌদ্ধবিহারটি রাজবাড়ি থেকে বেশ কাছেই। রাজবন বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ১৯৭৬ সালে। তেত্রিশ একর জায়গা জুড়ে প্রার্থনালয়, প্যাগোডা, ভিক্ষুদের আবাসস্থল, ভোজনালয় ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে।

বৌদ্ধবিহার ঘুরে দেখার পর আমরা রওয়ানা দিলাম পর্যটন কমপ্লেক্সের উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছে সিএনজিওয়ালা তার সিএনজিটাকে একটা গাছের সাথে শিকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তালা মেরে দিলো! ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে দেখি কয়েকটি ইঞ্জিন নৌকা ঘাটে বাঁধা। খুঁজেপেতে একটি নৌকা পছন্দ করে ভাড়া করতে গেলাম। মাঝি জানালো সে যেতে পারবে না। সিরিয়াল ধরে নৌকা ভাড়া করতে হবে,

তার সিরিয়াল পেছনে। এদিকে যে নৌকাটি ভাগে পড়ে সেটিতে উঠতে আমরা রাজি নই। নৌকায় সিট দূরে থাক, টায়ারের উপর কাঠ পাতবার গরজটুকুও দেখায়নি মাঝি ব্যাটা। অবশেষে ভাড়া দেবার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিটির সাথে মৃদু বচসার পর সিরিয়ালে থাকা দ্বিতীয় নৌকাটি ভাড়া করলাম।

যাত্রা হলো শুরু। কাপ্তাই লেকের বুক চিরে নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝি নৌকার হাল ধরে বসে আছে, পাশে বসা সিএনজিচালক। আমরা তিনজন ছইয়ের ছায়ায়। কাপ্তাই লেকের বিশালত্বের ভেতর কী যেন আছে! কোনো কারণ ছাড়াই মন ভালো হয়ে যায়।

নৌকা প্রথমে যাবে শুভলং ঝর্ণায়। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে পেদা টিং টিং। ইঞ্জিনের ভটভট শব্দ মাথায় এমন চাপ সৃষ্টি করে যে কিছুক্ষণ পর ইচ্ছা হলো একটা চেলা কাঠ নিয়ে মাঝিকে গিয়ে দু-চার ঘা লাগাই অথবা নিজে কাপ্তাই লেকের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেই।

চাকমা শব্দগুচ্ছ পেদা টিং টিং এর অর্থ দাঁড়ায় পেট টান টান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটা নাদুসনুদুস ছাগু আস্ত খেতে পারলে পেট টান টান হয়ে পেদা টিং টিং আকার ধারণ করে। শুভলং ঝর্ণা ঘুরে পেদা টিং টিং পৌঁছাতে বেলা গড়িয়ে বিকাল, তাই আমাদের পেটও ক্ষুধায় পেদা টিং টিং হয়ে আছে। অনতিবিলম্বে খেতে বসলাম। ছাগু ছিলো না তাই অর্ডার দিলাম বাঁশের ভেতর চাকমা কায়দায় রান্না করা ভাত, মুরগি ও আরেকটা নাম না জানা তরকারি। খাবার আসার পর খেতে গিয়ে দেখলাম ভাতের সাথে সমপরিমাণ ভেজা চাল মিশিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে, মুরগির স্বাদ এমনই যে দ্বিতীয়বার কেউ খেতে

বললে নির্ঘাত মার খাবে। তরকারির চেহারা দেখে ছুঁয়েও দেখার সাহস

হয়নি। খাবার মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ ছাদ থেকে একটা পিঁপড়ার বাসা খসে পড়লো গিন্নির মাথা-ঘাড় ছুঁয়ে খাবারের উপর। বেয়ারাকে ডেকে অভিযোগ করলাম। সে বললো, 'পিঁপড়ার জন্য আলাদা দাম দিতে হবে না। ওটা কমপ্লিমেন্টারি সার্ভিস!' পেদা টিং টিং থেকে ফিরলাম ক্ষুধায় কাতর পেদা টিং টিং পেট নিয়ে। প্রতিজ্ঞা করলাম জীবনে দ্বিতীয়বার ওমুখো হব না আর!

আমরা ফিরে আসছি চট্টগ্রামে। সূর্য ধীর লয়ে হেলে পড়ছে পশ্চিমে। রাঙামাটি শহর ছাড়ার খানিক বাদে শুরু হলো টিপ টিপ বৃষ্টি। সিএনজির পেছনের সিটের একপাশে গিন্নি, মাঝে আমি, অন্যপাশে আমাদের গাইড। সিএনজির দরজার পর্দা ছেঁড়া। দেখতে দেখতে বৃষ্টির ধার বেড়ে গেলো। গিন্নি ভিজে একাকার। আমি অর্ধভেজা। দেখতে দেখতে গিন্নির জ্বর উঠে গেলো। চিন্তিত হয়ে গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম, বান্দরবান গিয়ে কোথায় উঠব? উত্তরে সে বললো, "আমি আছি না? ওখানে যাবার পর একটা জায়গা ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলবো।" হতবাক হয়ে তাকে বললাম, 'তুই না বলেছিলি সবকিছুর বন্দোবস্ত করা হয়ে গেছে?' সবকিছুর বন্দোবস্ত করার কথা যে আদিবাসী ছেলেটির সে নিজেই ঢাকায় গিয়ে বসে আছে, অধোবদনে জানালো গাইড। শুনে ইচ্ছা হলো ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি।

সিএনজির ভেতর থমথমে আবহাওয়া। বউ বললো, এই অবস্থায় জ্বর নিয়ে মরে গেলেও সে বান্দরবানে যাবে না। বউয়ের প্রাণ রক্ষার্থে ট্রেকিংয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করে নতুন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো- আমরা মরে গেলেও বান্দরবান যাবো না। তবে কক্সবাজারে গিয়ে মরলেও ক্ষতি নাই, অন্তত থাকার জায়গা তো মিলবে! গাইডের কপাল পুড়লো। কক্সবাজারে গেলে যেহেতু আমাদের আর গাইডের প্রয়োজন নেই। তাই সে পরদিন ঢাকায় ফিরে আসবে।

ভয়াবহ ঝড়বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে চট্টগ্রামে পৌঁছলাম রাত সাড়ে আটটার দিকে। সিএনজি চালক পরামর্শ দিলো এই ঝড়ের ভেতর কক্সবাজার না গিয়ে রাতটা চট্টগ্রামে কাটাতে, কিন্তু কে শোনে কার কথা? সিএনজি থামিয়ে বাসের টিকেট খুঁজতে লাগলাম। গ্রীণ লাইনের বাস ছেড়ে গেছে, সোহাগের টিকেট পাওয়া গেলো না। আমাদের তখন জেদ চেপে গেছে। সিদ্ধান্ত নিলাম লোকাল বাসে যাবার। সিএনজিচালক পথিমধ্যে কক্সবাজারগামী এক লোকাল বাস থামিয়ে আমাদের উঠিয়ে দিলো। বৃষ্টির প্রবল তোড়ে তাকে ভালোভাবে বিদায় জানানোর সুযোগটুকুও জুটলো না।

বাসের ভেতর 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে' অবস্থা! একজন অতিরিক্ত লোক ধারণ করবার জায়গাটুকুও যেন নেই! আমরা ওঠামাত্র ড্রাইভার ও হেলপার যৌথ উদ্যোগে কাকে যেন হুমকিধমকি দিতে শুরু করলো। হতচকিত হয়ে খেয়াল করলাম আমাদের জন্য ড্রাইভারের ঠিক পেছনে প্রথম সারির সিট দুটো খালি করা হয়েছে। আমাদের গাইড গিয়ে বসলো ড্রাইভারের পাশে ইঞ্জিনের উপর। বাসের যাত্রী জনাচল্লিশেক মানুষ, শতিনেক মুরগি, গোটা দশেক ছাগু, ও ৪/৫বস্তা শুটকি! আমার স্ত্রী হঠাৎ আবিষ্কার করলো তার পায়ের নিচে এক বস্তা শুটকি। শুটকির কথা ড্রাইভারকে বলতেই তিনি গোটাকয়েক পেল্লায় হাঁক দিলেন। তাঁর হাঁকডাকে পেছন থেকে একজন এগিয়ে এসে বস্তা টেনে নিয়ে গেলো।

বাস কর্ণফুলি কাঠের সেতুর মাঝামাঝি এসে থেমে গেলো! সামনে পেছনে যতদূর চোখ যায় গাড়ি আর গাড়ি! খোঁজখবরে জানা গেলো আমাদের সামনের একটি বাসের টায়ার ফেটে চাকা সেতুর কাঠের ফাঁকে আটকে গেছে। ভয়াবহ ঝড়ের কারণে চাকা বদলাতে সময় লাগবে। একসময় বাতাসের বেগ কমে এলো কিন্তু বৃষ্টি কমার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। প্রায় ঘন্টা দুয়েক আটকে থাকার পর বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেলাম। মুক্তির আনন্দে বাস প্রচণ্ড গতিতে চলতে শুরু করলো কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে। বাকি পথটা নির্বিঘ্নেই কেটে গেলো।

রাত একটার দিকে আমরা কক্সবাজার বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে পৌঁছলাম। আমরা উঠবো হোটেল সী-ক্রাউনে। সী-ক্রাউন হোটেলটা কলাতলী ট্রাকস্ট্যান্ডের কাছে। ঝড়-বাদলের রাতে এতদূর কীভাবে যাবো ভাবছিলাম এমন সময় বাসের ড্রাইভার জানতে চাইলেন আমরা কোনো হোটেলে উঠবো। সী-ক্রাউনের কথা শুনে তিনি বললেন গাঁট হয়ে বসতে। তারপর খালি বাস ঝড়ের বেগে চালিয়ে কলাতলী ট্রাকস্ট্যান্ডে নামিয়ে দিয়ে গেলেন আমাদের। বাস থেকে নেমে দেখি সামনে উত্তাল বঙ্গোপসাগর! ফেনিল জলরাশি এসে সগর্জনে আছড়ে পড়ছে ত্রিশ ফুট সামনে! আধো অন্ধকারে বঙ্গোপসাগরকে মনে হচ্ছে যেন সাদা শাড়ি পরা হিন্দি সিনেমার সুন্দরী বিধবা নায়িকা! আশেপাশে তাকিয়ে কোথাও কোনো বিল্ডিংয়ের চিহ্ন দেখা যায় না। গাইডের দেখাদেখি বাম দিকে দৌড় দিয়ে কিছুদূর গিয়ে দেখি একটা বিল্ডিংয়ের কাঠামো আবছা দেখা যাচ্ছে। বিশাল লোহার গেটের গায়ে একটা কম পাওয়ারের লাইট বাল্ব বিষণ্ণ মুখ করে ঝুলছে। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম ত্রিমূর্তি। তড়িঘড়ি করে দুটো রুম ভাড়া নিয়ে উঠে গেলাম তিনতলায়। তারপর কাপড় বদলে নিচে নেমে এসে রাতের খাবারের খোঁজ লাগালাম। হোটেলের কিচেন বন্ধ হয়েছে বহু আগেই। কাউন্টারে বসে থাকা বিশ্বজিৎ’দা বললেন, রাস্তা পার হয়ে অ্যাঞ্জেল ড্রপে হানা দিতে। অ্যাঞ্জেল ড্রপে গিয়ে দেখলাম ওরা পাততাড়ি গোটাচ্ছে। প্রথমে খাবার দিতে পারবে না জানালেও আমাদের কাতর অনুরোধ শুনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে নিচে চলে গেলো কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না তা দেখার জন্য। খানিক বাদে ফিরে এসে জানালো খানিকটা ফ্রাইড রাইস ও চিকেন দিতে পারবে। তার কথা শুনে খুশিতে মনে মনে দুটো ডিগবাজি খেয়ে নিলাম।

আমরা খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অ্যাঞ্জেল ড্রপের সাজসজ্জা বেশ শৈল্পিক। দোতলার ছাউনি ঘেঁষে কাঠের কাঠামোর গায়ে তারে প্যাঁচানো হলদেটে এলইডি জ্বলছে। প্রত্যেক টেবিলে কাচের গ্লাসের ভেতর রঙিন মোম জ্বলছে। সবমিলিয়ে আধো-অন্ধকার চমৎকার এক পরিবেশ! পরবর্তীতে ২০১০ সালে আবার গিয়ে দেখি ২০০৬ সালে দেখা সৌন্দর্যের কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই।

সেদিন ভোররাতে একদিনের জন্য আমাদের সাথে এসে যোগ দিলো আমার এক সহপাঠী। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেই সে হইচই বাধিয়ে দিলো। তার বক্তব্য হচ্ছে সী-ক্রাউনের মতো পচা হোটেলে সে থাকবে না। হোটেল মিডিয়া ইন্টারন্যাশনালে সকালের নাশতায় একগ্লাস জ্যুস ফ্রি দেয় এবং ঘরে পরার জন্য একজোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল দেয় তাই সে মিডিয়া ইন্টারন্যাশনালে গিয়ে উঠবে। তার হইচই শুনে ম্যানেজার বেরিয়ে আসলেন। তখন দেখা গেলো ম্যানেজার জামান সাহেব আমার বন্ধুটির পূর্বপরিচিত। তিনি সব কথা শুনলেন তারপর আমাদের সকালের নাশতার সাথে এক গ্লাস করে জ্যুস দিতে নির্দেশ দিলেন আর তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে গোলাপি রঙের একজোড়া স্পঞ্জের

স্যান্ডেল কিনে এনে দিলেন আমার বন্ধুটিকে। অফসিজনে এমনিতেই হোটেল ভাড়ায় ত্রিশ- চল্লিশ ভাগ ছাড় দেয়, তারপরও আমরা নবদম্পতি শুনে আমাদের জন্য আঠারোশো টাকার রুম ফ্ল্যাট রেট পাঁচশো টাকা করে দিলেন। আমার বন্ধুটি পরিশোধ করলো নয়শো টাকা করে।

আমরা চারজনে মিলে সেদিন হিমছড়ির পাহাড়, হিসুর ধারার মতো বয়ে যাওয়া হিমছড়ি ঝর্ণা, ইনানি বীচ ইত্যাদি ঘুরে বেড়ালাম। রাতে হোটেলের কিচেন থেকে এক লোক এসে বিশাল এক কেক দিয়ে গেলো। রুম নাম্বার ভুল হয়েছে মনে করে কেকটা ফেরত পাঠালাম। কিছুক্ষণ পর কাউন্টার থেকে ফোন এলো- রুম নাম্বার ভুল হয়নি।

কেকটা ম্যানেজার সাহেব পাঠিয়েছেন নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে। খুশি হয়ে প্যাকেট খুলে দেখি কেকের গায়ে লেখা “হ্যাপি ম্যারেজ ডে”! সেদিন রাতে সহপাঠী ও গাইডকে বাসে তুলে দিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

পরবর্তী চারদিন আমরা দুজনে একে একে ঘুরে দেখলাম ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক, অগ্গ মেধা বৌদ্ধ ক্যাং, রাম কোট বৌদ্ধবিহার, বার্মিজ মার্কেট, ঝিনুক মার্কেট, হিলটপ সার্কিট হাউজ ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান।

ষষ্ঠ দিনে এসে আবিষ্কার করলাম হোটেল ভাড়া পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ টাকাপয়সা আমাদের সাথে নেই। টাকাপয়সা যা সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম তার প্রায় পুরোটাই ইতিমধ্যে শেষ! তারপর কীভাবে সব দেনাপাওনা চুকিয়ে ঢাকায় ফিরে এলাম সে আরেক বিশাল গল্প!

নববর্ষে বার্লিনের পোস্টার- বালিকা

হাসিব মাহমুদ

১.

বার্লিন শোয়েনেবার্গ জায়গা শহরের বাইরের দিকে। হাউপটবানহফ থেকে ৫কিলোমিটারে মতো রাস্তা। উ-বান, এস-বান হয়ে গেলে একটু সময় লাগে। দিনটা আবার বাংলা পহেলা বৈশাখ। সকালে বেরুনোর সময় ফতুয়া পরে বাধ্য হয়ে উপরে জ্যাকেট সোয়েটার চাপাতে হলো কনকনে ঠাণ্ডার জন্য। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে দেখলাম বৈশাখের সাজ বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই। চটজলদি মুখে কিছু দিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আজকে গন্তব্য লিয়ানের বাসা।

বার্লিন শহরটা জার্মানির অন্য শহরগুলো থেকে একটু আলাদা। অন্য জার্মান শহরের মতোই এই শহরে যাতায়াতব্যবস্থা তাক লাগানোর মতো। এর ওপর ইউরোপের অন্য বড়ো শহর থেকে সস্তা, কিন্তু আধুনিক। জার্মানির সমস্ত বৈশিষ্ট্য ধারণ করেও এই শহরটা অনেক আন্তর্জাতিক। এই শহরে জার্মানির সবচেয়ে ঝাঁ চকচকে রাস্তা মেলে। সেই সাথে জার্মানিতে আমার দেখা সবচেয়ে নোংরা রাস্তাটাও এই বার্লিনে। এই শহরটা এখনও খণ্ডিত বার্লিনের স্মৃতি বয়ে বেড়ায়। বাড়ি ঘর স্থাপনা ইত্যাদি দেখে বলে দেওয়া যায় এই জায়গাটা পূর্ব নাকি পশ্চিম জার্মানির ভেতরে ছিলো। শোয়েনেবার্গ জায়গাটা যে পূর্বে পড়েছে সেটা সেখানকার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার স্টেশনে নেমেই বুঝলাম। উবান থেকে নেমেই চোখে পড়ে উলটো দিকের দেওয়ালে পুরোনো আদ্যিকালের ফন্টে লেখা ভিক্টোরিয়া লুইয়ে প্লাৎস।

ভিক্টোরিয়া লুইয়ে উ-বান স্টেশন

সকালে কফি খেয়ে বের হওয়া হয়নি বলে উবান স্টেশন থেকে উপরে উঠেই রাস্তার পাশের ক্যাফেতে ঢুকে পড়লাম। এই সময়টাতে সাধারণত জার্মানরা বাইরে পাতা চেয়ারে বসে কফি বিয়ার খায়। আমি কফি মেশিন থেকে বের হওয়া গন্ধটাও কফি রিচুয়ালের অংশ মনে করি বলে ভেতরেই উঁচু টুলগুলোর কোনো একটাতে বসি। ওরকম একটা টুলে বসেই কফির জন্য বললাম। কাউন্টারে কাজ করা বৃদ্ধা মহিলার গায়ে নেমপ্লেট দেখি লেখা ফ্রাউ ম্যুলার নাম লেখা। আমাকে ওদিক তাকাতে দেখেই নীরবতা ভাঙেন।

- ম্যুলার আমার স্বামীর নাম। তুমি ট্যুরিস্ট জার্মানিতে?

- না। আমি দক্ষিণে থাকি।

- বার্লিন পছন্দ হয়েছে? এখানে কার কাছে?

বুঝলাম এই বৃদ্ধা কথা বলার তেমন একটা লোক খুঁজে পান না সারাদিন। জার্মানিতে বৃদ্ধদের প্রচুর দুর্নাম। বদমেজাজ, শিশুদের অপছন্দ করা ইত্যাদি ম্যালা কারণ এর পেছনে আছে। এজন্য আমিও শর্টকাটে অল্প কথায় নিস্তার খুঁজি।

- বার্লিন খুব ভালো লাগছে। এখানে লিয়ানে নামে একজনের বাসা খুঁজছি।

- ঠিকানা আছে?

- হুমম, ভিক্টোরিয়া লুইযে প্লাৎস।

কফির কাপটা সামনে দিয়ে বললেন এখানে থেকে বেরিয়ে হাতের বাঁ দিকে ভিক্টোরিয়া লুইযে প্লাৎস। খুব বড়ো না জায়গা না, অতএব খুঁজে পেতে সমস্যা হবে না। জবাব স্বভাবসিদ্ধ হুমম ডাঙ্কে বলেই কফিতে মন দিলাম। আমার অনাগ্রহী মৃদু স্বর দেখেই হয়তো ফ্রাউ ম্যুলার একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন।

কফি খেয়ে বিল দিয়ে বেরিয়েই বাঁ দিকে একটু দূরেই দেখি ফ্রাউ ম্যুলারের কথামতো ভিক্টোরিয়া লুইযে প্লাৎস সাইনবোর্ড। এবং লিয়ানের বাসাটা সেই সাইনবোর্ডে পেছনেই। ঠিক যেমনটি শুনেছিলাম। লাল ইট, ধূসর পলেস্তারার বাসা।

লুইযে ভিক্টোরিয়া প্লাৎসে লিয়ানের বাসা

বাড়ির দরজার সামনে লিয়ানের ফ্যামিলি নেইম লেখা কোনো পোস্টবক্স দেখলাম না। নিচতলায় কিন্ডারগার্টেন, উপরতলাগুলোতে ফ্ল্যাটবাড়ি। ওদের কেউ কি এখন এখানে থাকে না? নাকি আমি ঠিকানাটা ভুল স্মরণ করছি? একটু হতাশ হয়ে কয়েকটা ছবি তুলে পেছন ফিরে ভাবতে থাকি এরপর কোথায় খুঁজবো।

হঠাৎ দেখি পাশের কফিশপ থেকে ফ্রাউ ম্যুলার বের হয়ে আসছেন। বললেন,

- তুমি কি লিয়ানে বার্কোইৎসের বাসা খুঁজছিলে? রোটে কাপেলের লিয়ানে বার্কোইৎস?

- হ্যাঁ।

- ওদের কেউ এখানে এখন থাকে না। লিয়ানেকে ওরা প্লটযেনযেতে নিয়ে গিয়েছিলো।

- প্লটযেনযে?

ফ্রাউ ম্যুলার হাতের ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বললেন। দোকানে ঢুকে একটা কাগজে একটা ঠিকানা লিখে বললেন শোয়েনেফেল্ড এয়ারপোর্টে যাবার দিকেই ওটা পড়ে। শহরে গিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়া বাস ধরতে বললেন। অল্প কথায় ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম ফ্রাউ ম্যুলারের কাছ থেকে।

২.

বার্লিন শহরটা বিশাল আকারের এক শহর। আমার মতো যারা ছোটো শহরে থাকে তারা ওখানে গিয়ে থতমত অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ে। রাস্তা হারানোর বিপদ এড়াতে উলটো দিকের উবান ধরে শহরের মাঝখানে গিয়ে এয়ারপোর্টের বাস ধরলাম। প্লটযেনযে যেহেতু এয়ারপোর্টের কাছে সেহেতু একটু সময় লাগে সেখানে যেতে। এয়ারপোর্টে কাছে যেতেই ড্রাইভারকে বললাম কোথায় নামতে চাই। ড্রাইভার সাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে আমার চেহারাটা একটু দেখে গাঁকগাঁক করে জবাব দিলো আমাকে বলবে সে কখন বাস থেকে নামতে হবে।

বাস থেকে নেমেই ছোট্ট সাইনবোর্ড দেখে দেখে গলিঘুপচিতে কয়েকপাক ঘুরে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছলাম। বেশ বড়ো গেটে গেডেঙ্কস্টায়েটে প্লটযেনযি লেখা। গেটটা স্থানীয় জেলখানার দেওয়াল ঘেঁষে। ওটা দেখে বাস ড্রাইভারের চাহনির মানে বুঝলাম। গেট দিয়ে ঢুকেই একটা চত্বর। একা এক পুলিশ অফিসার এদিক ওদিকের ছবি তুলছে। ছবি তোলার ধীরস্থির আয়েশি ভঙ্গি দেখে বুঝলাম সে অফডিউটিতে। ডিউটি শেষে হয়তো ঢুঁ মারতে এসেছে। সেও কি মেলানির কাছে এসেছে নাকি? দেশে পুলিশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা থেকে ওদের কাছ থেকে দূরে থাকার জ্ঞানটা অবচেতন মনে ঢুকে গেছে। এই জন্যই হয়তো একটু দূর দিয়ে হেঁটে জায়গাটা পার হলাম।

প্লটযেনযে প্রবেশদ্বার

চত্বরের শেষ মাথায় একটা বড়ো স্মরণমঞ্চ। ওটা পার হলে একটা ছোটো ঘরমতন। ঘরটা ফাঁকা। চারপাশের দেওয়ালে বিভিন্ন বিখ্যাত অবিখ্যাত লোকেদের নামধাম তারিখের লিস্ট। তুর্কি নাট্যকার, রাশান কবি থেকে শুরু করে স্কুলে পড়া কিশোর-কিশোরীও তালিকায় আছে। আচ্ছা, লিয়ানে কি স্কুলটা শেষ করতে পেরেছিলো? নাকি এর আগেই তাকে ধরা পড়তে হয়? মেলানির এক ছেলেবন্ধুও ছিলো জানতাম। লিয়ানের গর্ভে তার এক সন্তান ছিলো। ওদের কোনো খবর আছে?

রুমের শুরু থেকে টাঙানো তালিকাগুলো পড়তে পড়তে আগাচ্ছিলাম। ওখানেই দেখলাম একটা তালিকায় শেষের নামটা লিয়ানে বার্কোইৎস। পড়ে দেখলাম দেশদ্রোহিতা এবং শত্রুকে সহায়তার অপরাধে লিয়ানেকে

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একটু পরেই ৭০ বছর আগে রুমটার কিছু ছবি। দেখলাম ফাঁকা ঐ রুমটা জল্লাদখানা ছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়।

বাস্তবে মেলানির অপরাধ খুব বড়ো কিছু ছিলো না। নাৎসি প্রতিরোধ গ্রুপ রোটে কাপেলের(ইংরেজিতে রেড অর্কেস্ট্রা) হয়ে কিছু পোস্টার লাগানোর দায়িত্ব নিয়েছিলো সে। এই অপরাধেই মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে তাকে। ফাঁসি থেকে অব্যাহতির সুপারিশ থাকলেও হিটলার নিজে সেই সুপারিশ রদ করে ফাঁসি বহাল রাখতে আদেশ দিয়েছিলেন।

প্লটযেনযে জল্লাদখানা

শেষ মাথায় সিলিঙে ফাঁসির দড়িগুলো ঝোলানো। ডানদিকে কালো দরজা ও দড়ির মাঝখানটাতে গিলোটিনটি ছিলো।

জল্লাদখানার শেষ মাথায় ফাঁসির দড়িগুলো সেই আগের মতোই ঝোলানো আছে। দরজার পাশে গিলোটিনটা শুধু নেই। মেলানিকে কীভাবে খুন করা হয়েছিলো? গিলোটিনে নাকি ফাঁসির দড়িতে? ভাবনাটাকে আগাতে না দিয়ে জল্লাদখানা থেকে বেরিয়ে আসলাম।

জল্লাদখানা থেকে বেরিয়েই সেই পুলিশ অফিসারের মুখোমুখি।

- কোনো সাহায্য করতে পারি তোমাকে?

- না, ধন্যবাদ।

- এখানে খুব বেশি ট্যুরিস্ট আসে না মনে হয়। তুমি কোন দেশ থেকে এসেছো?

- বাংলাদেশ।

- বাংলাদেশ?

- দেশটা ইন্ডিয়ার পাশে ...

- ওহ! কেমন দেখলে ভিতরে?

- দেখলাম পোস্টার লাগানোর অপরাধে, কবিতা, নাটক লেখার অপরাধে নাৎসিরা কীভাবে মানুষ মেরেছে।

দুজনেই চুপ করে যাই এরপর। কিছুক্ষণ এভাবে যাওয়ার পর পুলিশ অফিসার বললেন তাকে অনুসরণ করতে। একটা জিনিস নাকি দেখাবেন। অফিসার স্মরণমঞ্চের পাশে এক কোনায় একটা পাথরে বানানো পানপাত্রের মতো দেখতে জিনিস দেখালেন। বললেন ওটা নাকি উর্ন। উর্ন হলো মৃতদেহ পোড়ানোর পর সেটা থেকে পাওয়া ছাই সংরক্ষণের পাত্র। প্লটযেনযেতে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া 'অপরাধী'দের যে চুল্লিতে পুড়িয়ে ছাই বানানো হতো সেই চুল্লি থেকে ছাইগুলো সংগ্রহ করে সেটা ঐ পাথরেও উর্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এক অর্থে লিয়ানের দেহাবশেষও ঐ উর্নের মধ্যে আছে।

প্লটযেনযেতে সংরক্ষিত উর্ন

তো এভাবে নববর্ষের সকালে দূর দেশের এক পোস্টার বালকের সাথে আরেক দেশের পোস্টার- বালিকার দেখা হলো। উর্নের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে "শুভ নববর্ষ পোস্টার- বালিকা" বলে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

[১] এসবান (S-bahn) হলো বার্লিনের মেট্রোরেইল যেগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড ও গ্রাউন্ড দুই লেভেলেই চলে। উবান (U-bahn) সাধারণত মাটির নিচ দিয়ে চলে। উপরে ওঠে না।

[২] ডি রোটে কাপেলে - দ্য রেড অর্কেস্ট্রা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানিতে নাৎসি রেজিস্ট্যান্স গ্রুপ।

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Orchestra_%28espionage%29

[৩] প্লটযেনযে প্রিজন

http://en.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%B6tzensee_Prison

[৪] রায়ের পাতাটা এখানে দেখা যাবে।

http://www.gedenkstaette-ploetzensee.de/zoom/09_6_e1.htm

[৫] লিয়ানে বারকোইৎসের উইকিপাতা

http://en.wikipedia.org/wiki/Liane_Berkowitz

বি আর হিলস, দস্যু বিরাপ্পন ও বাঘ মামা

শেখ জলিল

যাত্রা হলো শুরু

অবশেষে টিম লিডারের অক্লান্ত চেষ্টায় সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটি আমাদের হাতের মুঠোয় আসে। প্রশিকা স্বাস্থ্য কর্মসূচীর চার জন ডাক্তারকে ভারতের বিভিন্ন সংস্থার হারবাল মেডিসিন প্রকল্প দেখার ছাড়পত্র দেয়। যথাসময়ে পাসপোর্ট, ভিসা সংগ্রহ করে ১০. ০৯. ৯৯ তারিখ সকাল ৯টায় বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বাসা থেকে রওনা হই। চারজনের দলে আমরা ছিলাম ডা. শেখ মো. মতিউর রহমান (টিম লিডার), ডা. জাহানারা খানম, ডা. তাহমিনা আহমেদ এবং আমি।

এয়ারপোর্টে গিয়ে যাত্রার প্রারম্ভেই বাংলাদেশ বিমানের চিরাচরিত বিড়ম্বনার শিকার হই আমরা। আমাদের জানানো হয় ১১: ৩০ টার বিমানে কোলকাতায় যাওয়া সম্ভব হবে না। রাগে ডা. মতি ভাই ডিউটি অফিসারদের রীতিমতো হুমকির মুখে ফেলে দেন। বলেন- যদি আজ কোলকাতা না পৌঁছতে পারি, তবে আমরা চার ডাক্তার প্রশিকার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ বিমানের বিরুদ্ধে কেস করে দেবো। সেই সাথে ভারতে আমাদের শিডিউলকৃত বিভিন্ন প্রোগ্রাম মিস করার জন্য ক্ষতিপূরণও চাইবো। অনেক বচসার পর ডিউটি অফিসাররা আমাদের সন্ধ্যা ০৬: ৩০ টার বিমানে কোলকাতায় যাবার নিশ্চয়তা দেয়। শুধু তাই নয় ভিতরে না ঢোকার কারণে আমরা যে খাবার মিস করেছিলাম সেই দুপুরের খাবারও তারা আমাদের খাইয়ে দেয়।

প্রায় সন্ধ্যা ৭টায় কোলকাতার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছাই। বিমান থেকে নেমেই আবার বিড়ম্বনা হলো। চেকিং- এ ডা. মতি ভাই ও ডা. তাহমিনা পার হয়ে যায়। আটকানো হয় আমাকে এবং ডা. জাহানারাকে। কোন সংস্থায় যাচ্ছেন, তাদের সাথে কীসের মিটিং এসব নানা প্রশ্নের উত্তর পেয়েও যখন কাস্টমস অফিসার সন্তুষ্ট নন, তখন বাধ্য হয়েই আমি আমাদের টিম লিডার ডা. মতি ভাইকে ডাকতে বলি। তিনি আমাদের ভ্রমণের সমস্ত কাগজপত্র দেখানোর পর আমরা ছাড়া পাই। এরপর বিমান বন্দরে আমরা সবাই প্রথম কিছু ডলার ভাঙাই এবং পরদিন আমাদের ব্যাঙ্গালোর যাবার টিকেট কনফার্ম করি। সেদিন রাতে আমরা চারজন এয়ারপোর্টের কাছাকাছি টিপু সুলতান হোটেলে রাত কাটাই।

ব্যাঙ্গালোরের পথে

১১. ০৯. ৯৯ তারিখ সকাল ১১টায় আমরা ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার জন্য কোলকাতা বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হই এবং ১২: ৩০ টায় জেট এয়ারওয়েজে ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। যে জিনিসটা চোখে পড়ার মতো তা হলো ভারতের বেসরকারি বিমানের পাসওয়ে, চেকিং এবং অভ্যর্থনা সবই ভালো। বিশেষ করে বিমানবালাদের সুন্দর ব্যবহার ও সার্ভিস আমাদের মুগ্ধ করে। যাত্রাপথে প্লেনের ভেতর প্রায় আধ ঘন্টার মতো বিরতি ছিলো হায়দ্রাবাদে। বিকেল প্রায় ৪: ৩০ টায় আমরা ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছাই। এয়ারপোর্টে ডা. রবি নারায়ণের লোক আমাদের অর্ভ্যথনা জানায়। আমরা সকলে মিলে তাদের পাঠানো ট্যাক্সিযোগে ইউনাইটেড থিওলজিক্যাল কলেজের গেস্ট হাউজে যাই। পথে ব্যাঙ্গালোর শহর যতটুকু দেখার সুযোগ হলো তাতে মনে হলো- আমরা দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নত শহরেই বোধ হয় বেড়াতে এসেছি। ইউনাইটেড থিওলজিক্যাল কলেজে আমাদের সকলের থাকার ব্যবস্থা আগেই ঠিক করা ছিলো। সন্ধ্যায় ডা. রবি নারায়ণ আসেন। প্রথম দর্শনেই তাঁর

ব্যক্তিত্ব এবং আতিথেয়তা আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের সফরের পরবর্তী কর্মসূচী নির্ধারণ করে নিই আমরা।

১২.০৯.৯৯ সকাল ৯ টায় ডা. রবি নারায়ণ আবার ইউনাইটেড থিওলজিক্যাল কলেজে আসেন এবং আমাদেরকে পরবর্তী ভ্রমণসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেন। সেদিনই সকাল ১০টায় আমরা চামরাজানগর জেলার ইয়েলান্দর তালুকের(থানার) বিআর হিলস (Billigiri Ranganabata Hill)-এর উদ্দেশ্যে ভাড়া করা ট্যাক্সিযোগে রওনা হই। আমাদের ভ্রমণের পরবর্তী দিনগুলোর সাথী ছিলো ড্রাইভার কাম গাইড জগদীশ সিং। জগদীশ ভালো ইংরেজি বলতে পারে এবং বেশ চটপটেও। পরে বুঝলাম প্রথম দিন ব্যাঙ্গালোরের বিমান বন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে ট্যাক্সি নিয়ে সে-ই অপেক্ষা করছিলো। জগদীশের আরও একটা ভালো গুণ ছিলো কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু প্রদেশের দর্শনীয় সকল জায়গাই তার পরিচিত এবং একজন ভালো গাইডের মতো সবকিছু প্রাণবন্ত বর্ণনা করতে পারে সে।

সড়কপথে দীর্ঘ ভ্রমণে আমাদের প্রথম আকর্ষণ করলো ব্যাঙ্গালোরের সন্নিকটে রামানগর নামক এক জায়গা। রাস্তার পাশেই পাথুরে পাহাড় হাতির মতন যেন সটান দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশ দিয়ে চলে গেছে মহীশূর যাবার রেল লাইন। জগদীশ জানালো- এই পাথুরে পাহাড়েই আমজাদ খান, অমিতাভ বচ্চন, ধর্মেন্দ্র অভিনীত বিখ্যাত ছবি শোলে'র বেশির ভাগ অংশের শ্যুটিং হয়েছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে আমরা আমাদের ক্যামেরায় অপরিপক্ক হাতে পাহাড়ের মনোরম দৃশ্যের কিছু ছবি তুললাম।

বিআর হিলস

যাত্রা পথে চোখে পড়লো কাবেরী নদী। জোরে জোরে গেয়ে উঠলাম - কাবেরী নদীজলে কে গো বালিকা। জগদীশ অবশ্য বাংলা বোঝে না। তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম- বিশ্বকবির নাম শুনলেও বিদ্রোহী কবি নজরুলের নাম শোনেনি কখনও সে। কাবেরী নদীর সৌন্দর্য্ দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। জগদীশকে বললাম ট্যাক্সি থামাতে। পাহাড়ি নদীটির পানি খরস্রোতা গতিতে যেভাবে উঁচু থেকে নিচু জায়গায় পড়ছিলো- দূর থেকে তাকে অনেকটা জলপ্রপাত বলেই ভ্রম হচ্ছিলো। আমার ক্যামেরায় নদীর দৃশ্যটার ছবি তুলে নিতে ভুললাম না।

দূরে বিআর হিলস

২১৪ কিলোমিটারের দীর্ঘ পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে বিকেল ৫টায় আমরা বিআর হিলস-এ পৌঁছালাম। পৌঁছেই আমরা সেখানকার সংস্থা বিবেকানন্দ গিরিজানা কল্যাণ কেন্দ্র (ভি. জি. কে. কে)-এর প্রধান ডা. এইচ সুদর্শনের সংগে দেখা করলাম। তিনি তাঁর সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচী সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। আমাদের দলনেতাসহ আমরা সকলে প্রশিকার বিভিন্ন কর্মসূচী তুলে ধরলাম। এছাড়া সকলেই আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্মসূচী নিয়েও পরিচিত হলাম। চা-পান শেষ করে এরপর আমরা তাদেরকে প্রশিকার কর্মসূচীভিত্তিক বিভিন্ন কাগজপত্র প্রদান করলাম। তার সাথে আলোচনা শেষে আমরা পরবর্তী দিন অর্থাৎ ১৩.০৯.৯৯ ইং তারিখের কর্মসূচী নির্ধারণ করে নিলাম।

ডা. এইচ সুদর্শনের সঙ্গে

১২.০৯.৯৯ইং তারিখ সন্ধ্যায় আমরা তাদের সংস্থার জিপ নিয়ে সেখানকার রঙ্গনাথন মন্দির দেখতে যাই এবং Sight Seeing-এ পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলো দেখি। বোধ করি ঐ মন্দিরের নামেই হয়েছে পাহাড়ের নাম। পুরোনো মন্দিরের বিভিন্ন কাহিনি শোনান মি. শ্রীনিবাসন। মন্দিরে কীভাবে ধর্মব্যবসা হয় এবং সহজসরল লোকজন প্রতারিত হয়- এসব তিনি সবিস্তারে আমাদেরকে বলেন। দেখলাম মন্দিরের ভিতরে রক্ষিত পাথুরে মূর্তি এখনো পুরাকীর্তির নিদর্শন হয়ে আছে।

সন্ধ্যার পর সেই জিপে করেই আমরা অভয়ারণ্য দেখতে বের হই। অভয়ারণ্যে বাঘ আছে এ কথাটা প্রথম শুনি মি. শ্রীনিবাসনের মুখে। আশা ছিলো রাতে বিআর হিলস-এর অভয়ারণ্যে বাঘমামাকে দেখবো। রাস্তায় শ্রীনিবাসনের কাছ থেকে বিরাপ্পন নামক আরেক বাঘের গল্প শুনলাম। দস্যু সম্রাট বিরাপ্পনের কথা পত্রপত্রিকায় অনেক পড়েছিলাম। এবার শুনলাম তার সত্যিকারের জীবনকাহিনি। তার জন্ম মহীশূরের নিকটবর্তী এক পাহাড়ি গোত্রে। কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু উভয় প্রদেশের গরিব লোক তাকে পছন্দ করে। বিশেষ করে তামিলনাড়ুর জনগণ তাকে খুব ভালোবাসে। সে নিজেও তামিলভাষী। সময়-অসময়ে গরিবদেরকে অর্থসহ বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে সে। কিন্তু পুলিশ কখনো তাকে ধরতে পারে না। কারণ পুলিশের উপরের স্তর থেকে নিচু পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় তার শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে। শ্রীনিবাসন শোনালেন- একবার এক জনসভায় পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য কীভাবে বক্তৃতা রেখেছিলো বিরাপ্পন। শুনলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। শ্রীনিবাসন আরো জানালেন- ঐ এলাকা থেকে নির্বাচনে দাঁড়ালে বিরাপ্পন নাকি পাশ করেও যেতে পারে।

জানলাম- বিরাপ্পনের বিচরণক্ষেত্র কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়। তার প্রধান টার্গেট পুলিশ ও বনরক্ষীরা। দস্যুতা ও চোরাকারবারিতে সে এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। খুন, রাহাজানি, অপহরণ, কাঠ চোরাচালান, হাতি নিধনসহ বিভিন্ন কেস রয়েছে তার নামে।

কীভাবে সে এত বড়ো দস্যু হলো সেও এক বিরাট কাহিনি। পুলিশ তার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করে। কোলের ছেলেকে মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তার এক ভাই পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর সায়ানাইড বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। এসব কথা শুনলে দস্যু ফুলন

বিরাপ্পনের বিচরণক্ষেত্র

দেবীর কাহিনিই মনে পড়ে যায়। এরপর শ্রীনিবাসনের কাছ থেকে যে গোপন খবর শুনলাম তা আরও অ্যাডভেঞ্চারের। পুলিশের সাথে একবার এক সম্মুখযুদ্ধে বিরাপ্পন আহত হয়েছিলো। ভি. জি. কে. কে হাসপাতালের স্টাফ নার্স অর্থাৎ শ্রীনিবাসনের স্ত্রীকে চোখ বেঁধে উঠিয়ে নিয়ে যায় বিরাপ্পনের লোকেরা। বিরাপ্পনকে চিকিৎসার পর আবার তাকে সশরীরে ফিরিয়েও দিয়ে যায়। সাথে সাথে এও বলে দেয়- বিরাপ্পনের আহত হওয়ার খবর কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলা হবে তাকে। শ্রীনিবাসনের স্ত্রী এরপর অনেকদিন মুখ খোলেনি এবং খুব ভয়ে ভয়েও ছিলো। তারপর একদিন ঘটে এক মজার ঘটনা। বেশ কিছুদিন পর বিরাপ্পনের লোকেরা তার স্ত্রীকে ভালো বেশ কিছু উপঢৌকন পাঠিয়ে

দেয়। গল্প শুনতে শুনতে বুঝলাম শ্রীনিবাসনের গলাও বেশ ভারী হয়ে আসছে।

বাঘের দেখা পেলাম শেষে

আগেই বলেছিলাম কপাল খুললে বাঘ দেখার গল্প বলবো। ইয়েলান্দর থেকে ফেরার পথেই ঘটলো সেই ঘটনা। অভয়ারণ্যের ভিতর দিয়ে যাবার পথে হরিণ, বন্য শূকর, ময়ূর ও বনমোরগ দেখেছিলাম। ক্যামেরায় ছবিও তুলেছিলাম। এবার ভাগ্য আরও সুপ্রসন্ন হলো। সবচেয়ে আগে বোধ করি আমিই দেখেছিলাম। দূর থেকে ভেবেছিলাম- বনের পাশে একটা মরা গরুর কাছে শিয়াল হাঁটাহাঁটি করছে। কিন্তু জগদীশের চিৎকারে সেই ভুল ভাঙলো। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির জানালা উঠানোর তাগিদ দিয়েই সে চিৎকার করে উঠলো- প্যান্থার, প্যান্থার! দেখলাম একটা প্যান্থার অর্থাৎ চিতাবাঘ সবেমাত্র একটা গরু মেরে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গরুর গলায় তখনো রক্তমাখা দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। আমাদের দলের সবাই কমবেশি ভয় পেয়ে গেলাম। এমন অবস্থা হলো ভয়ের চোটে গাড়ির জানালাও ঠিকমতো বন্ধ করতে পারছিলাম না আমরা। ধীরে ধীরে বাঘটার পাশ দিয়েই ট্যাক্সি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো জগদীশ। ভাবলাম এই বুঝি লাফ দিয়ে উপরে এসে পড়লো বাঘটা। কিন্তু না, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ শিকারের প্রতি। একটু দূরে সরে গেলেও শিকার ছেড়ে চলে গেলো না সে। আমি ক্যামেরায় ছবি তোলার ইচ্ছেটা জানাতেই জগদীশ মানা করলো। বললো- এতে বাঘটা ক্ষেপে যেতে পারে এবং আক্রমণও করে বসতে পারে। ছবি তোলা হলো না আমার। শ্রীনিবাসন বললেন- আপনাদের ভাগ্য সত্যিই অনেক ভালো। আমি এত বছর ধরে এখানে থাকলেও চাক্ষুষ এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

খাবার নিয়ে বিড়ম্বনা

বিআর হিলস-এ থাকাকালীন আমাদের সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়তে হয় খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে। উল্লেখ্য দক্ষিণ ভারতের প্রায় সবাই নিরামিষাশী। আমরা যে সংস্থায় বেড়াতে এসেছিলাম তারা হলেন স্বামী বিবেকানন্দের অনুসারী ও নিরামিষাশী। সংস্থাটির নামও স্বামী বিবেকানন্দের নামে। একই ডাইনিং রুমে বসে প্রার্থনা শেষে সবাইকে খাবার খেতে হয়। আমাদের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হলো না। প্রথম দিন খাবার খেয়ে চেষ্টা করলাম বাইরের খাবার আনাতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিআর হিলস-এ কোনো হোটেল নেই। রান্না করার মতো লোকজনও পাওয়া গেলো না। বাধ্য হয়েই তাদের সেই বিখ্যাত নিরামিষ এবং ব্যতিক্রমী রান্না খেতে হলো সবাইকে।

দ্বিতীয় দিন শোনা গেলো আমাদের জন্য মাছ ধরা হবে। রান্না করা হবে শুধু আমাদেরকে পরিবেশনের জন্য। রাতে খাবার সময় মাছের কথাটা মি. রামাচরণকে মনে করিয়ে দিতেই ডা. মতি ভাই নিয়মমাফিক চটে গেলেন। কী আর করা? নীরবে নিশ্চুপে খাবার শেষ করলাম। খাবারের শেষের দিকে পায়েসের মতো কী একটা খাবার খেয়ে আমার তো বমি আসার উপক্রম হলো।

বিবেকানন্দ গিরিজানা কল্যাণ কেন্দ্র

ডাইনিং রুমের স্পেশাল গন্ধটাই আমাদের সবার কাছে অসহ্য লাগত। বিশেষ করে ডা. তাহমিনার খাওয়া তো প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিলো। আমাদের এ সুকরুণ অবস্থা অনুধাবন করে মি. শ্রীনিবাসন ইয়েলান্দর থেকে ফেরার পথে দুই হালি ডিম কিনে এনেছিলেন। সেদিন রাতে চুপি চুপি তার স্ত্রীর হাতের ওমলেট দিয়ে খাবারটা ভালোই জমেছিলো সবার। খাবার পর নিদ্রাদেবী খুব তাড়াতাড়ি বরণ করে নিয়েছিলো আমাকে।

পুণ্যভূমি

কৌস্তুভ

(১)

ভ্রমণকাকাহিনি লিখতে ভাগ্যের প্রয়োজন। দার্জিলিং- পুরী- দীঘা যে বাঙালির বাঁধা অবকাশযাপন, সে উৎসুক হয়ে থাকে কোনো দুর্গম, স্বল্পপরিচিত, মনমুগ্ধকর স্থানের বিবরণ শুনতে। কোনো বিখ্যাত সভ্যতার পীঠস্থান, কোনো প্রাচীন নগরীর ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ার পর মনোভ্রমণ করে বহুদিন। কিন্তু এমন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ বাঙালি তেমন পায় কই? পেয়েছিলেন আলিসাহেব, তাঁর অসামান্য কলমে দক্কাদূর্গ, খাইবার পাস এমনকি না- দেখা পানশীর পর্বতেরও ঘুম- কেড়ে- নেওয়া বর্ণনা দিয়ে গেছেন। অবশ্য তিনি পারতেন, যেকোনো ভ্রমণকেই স্মরণীয় করে রাখার মতো লেখনীর জোর তাঁর ছিলো; বন বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আশপাশের গ্রামগুলির মধ্যে দিয়ে সাধারণ হাইকিংয়ের অভিজ্ঞতাকেও মনোগ্রাহী করে গেছেন তিনি তাঁর জার্নালগুলিতে। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রধান অলংকরণ ছিলো মানবহৃদয়। খুবই সহমর্মিতার সঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষগুলিকে এঁকেছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের ব্যবহার, তাদের সংলাপ, তাদের আশা- আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থেকে টুকরো টুকরো আনন্দবেদনা তুলে এনে আমাদের সমব্যথী করে তুলেছেন। মুইন- উস- সুলতানের প্রয়োজন কী– কে ভুলতে পারে, এক সামান্য ভৃত্য কিন্তু বরফের থেকেও শুভ্রতর যার হৃদয় সেই আবদুর রহমানকে?

সমস্যা হলো, না আছে আমার তেমন দুর্লভ স্থানের ভ্রমণাভিজ্ঞতা যা দিয়ে পাঠকদের মুগ্ধ করতে পারি, না রয়েছে বলার মতো কিছু মানুষদের গল্প যা দিয়ে তাঁদের মন ছুঁয়ে যেতে পারি। তাহলে, লেখা যায় কী নিয়ে?

(২)

গত বছর শীতের ছুটিতে যখন বাড়ি ফেরা গেলো, তখন আত্মীয়স্বজনের চরণদর্শন এবং পর্যাপ্ত চকলেটবিতরণের পরেও পরিকল্পনামাফিক কিছু উদ্বৃত্ত সময় মিললো। দাদু অর্থাৎ পিতামহ প্রয়াত হয়েছেন বছরদুয়েক হলো, শাস্ত্রমতে এই ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান ও তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের যাতে স্বর্গবাসে কোনোরূপ সমস্যা না হয় সেজন্য এখন গয়াধামে গিয়ে পিণ্ডদান করা বিধেয়। আমরা যে এ বিষয়ে আদৌ উৎসাহী ছিলাম এমন নয়, কিন্তু ঠাকুমার এসব দিকে তীব্র নজর। বৃদ্ধা ইমোশনাল পলিটিক্সেও বড়োই দক্ষ, বাবাকে নিয়মিতই বলে থাকেন, ‘দেখ, আমি মারা গেলে তুই এসব আচার পালন করবি কি না সে তো আর আমি দেখতে আসবো না, তোর বাবার এই শেষ আচারটুকু অন্তত পালন কর, আমি দেখে যাই…’। আমার পিতৃদেব বড়োই মাতৃভক্ত, এই নির্বন্ধ উপেক্ষা করতে না পেরে স্থির করেছিলেন, তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রবাস থেকে ফিরলেই সেই সুযোগে সপরিবারে কিছুদিনের জন্য গয়া যাওয়া হবে।

পিণ্ডদানের কাজ যদিও কেবল এক বেলার, স্থির করা হলো যে, যেহেতু আমার চলে যাওয়ার পর থেকে আর সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না, তাই আশপাশে কয়েকদিন বেড়ানো হবে– রাজগীর, বুদ্ধগয়া, কাশী ইত্যাদি। আমাকে সঙ্গে নেওয়ার কারণ মূলত ওই বেড়ানোই, নিয়মনিষ্ঠায় শিক্ষিত করে তোলা নয়– আমার ধর্মপ্রেমহীন পিতাশ্রী এই বিষয়ে বড়োই উদার। গয়ায় গিয়েও এ- ই বলেছেন, যে ‘দেখ বাছা, যখন বুড়ো হয়ে যাবো, তখন ভালো করে দেখাশোনা করিস, তা হলেই হবে, মরে গেলে এসব ভড়ং করলি কি না সে তো আর দেখতে আসবো না।’

(৩)

আমি স্কুলছাত্র থাকাকালীন যেসব গার্জেনের সাথে বাবার বন্ধুত্ব হয়েছিলো, তাঁদের একজন, সেনবাবু – রেলের কর্মচারী, কিন্তু নিয়মিত ফ্যামিলি- পাস পাওয়া সত্ত্বেও কোথাও বেড়াতে যান না কখনও। এখন ছেলেরা বড়ো হয়ে গেছে, নিজের মতো পড়াশোনা করছে, তাই আমরা তীর্থে যাব শুনে বাবাকে বললেন, বুড়োবুড়ি হতে চললাম কিন্তু জীবনে তো কোথাও যাওয়া হলো না, রিটায়ার করার সময়ই এসে গেলো, এখন চলুন আপনাদের সাথে ভিড়েই পড়ি। আর ওনার স্ত্রী বড়োই ধর্মবতী, গয়া- কাশীর মতো পুণ্যধামে যাওয়া হচ্ছে শুনে বড়োই পুলকিত। ওনাদেরও পরিবারের দুজনের পিণ্ড দেওয়ার কাজ বহুদিন পড়ে আছে, সেটা সেরে ফেলাও যাবে।

অতএব জানুয়ারির প্রথম দিকেই একদিন গয়ার ট্রেনে উঠে বসা হলো। আমরা তিনজন, আর ওঁরা দুজন। রাত্রের ট্রেন, জানালা একেবারে এঁটে বন্ধ করে দেওয়া লাগে। এ সময়ে উত্তর ভারতে দারুণ ঠাণ্ডা পড়ে, তাপমাত্রা ২- ৩ ডিগ্রিতে নেমে যায়। এই সময় বস্টনে থাকে - ২৩ ডিগ্রি, অতএব সে তুলনায় হয়তো নেহাতই তুচ্ছ, কিন্তু আমেরিকায় যেমন সেন্ট্রাল হিটিং চলে ঘরবাড়ি- অফিস এমনকি বাস- ট্রেনেও, দেশে সেসব কোথায়? অতএব সুটকেসের অর্ধেকই ভরে ফেলা হলো মোটা মোটা সোয়েটার- মাফলার- টুপিতে।

সেন- কাকিমা সারা রাস্তা জুড়ে যা করবেন, ট্রেনেও তাই- ই নিয়ে বসেন, তাঁর পেয়ারের রাধাকৃষ্ণ মূর্তির জন্য কুরুশ দিয়ে ছোটো ছোটো ফ্রক বুনছেন। সেসবের সৌন্দর্য দেখিয়ে এই পাষণ্ডকে দ্রবীভূত করার চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে বোনাতেই মন দেন। তুষারের দেশে তাঁর ছোট্ট ছেলেটিকে ওম দেওয়ার জন্য মা বুনছেন একটা মোটা সোয়েটার। কয়েকদিন পরে একটা ছোটো ট্রেনজার্নিতে কয়েকঘন্টার জন্য আমাদের সাথী হয়েছিলেন একদল দেহাতি মহিলা। সুন্দর দেখতে উল'টা একজন তরুণী হাতে নিয়ে দেখতে চান। তারপর মা- কে বলে বুনতে শুরু করে দেন। অতি দ্রুত হাতে একটা অংশ শেষ করে লাজুক হাসিতে ফেরত দিলেন। সরল, অনাবিল এই মানুষেরাই তো আসল ভারতবর্ষ। আমার ডাচ বন্ধু ভারত বেড়াতে আসতে চায়; তাকে বলি, ভারতকে চিনতে হলে ফ্লাইটে নয়, ভ্রমণ কর সেকেন্ড ক্লাসে।

ধর্ম নিয়ে ব্যবসার দুনিয়ায় কোথাওই কমতি নেই, হিন্দুধর্ম নিয়ে তো নেই- ই। তীর্থক্ষেত্রগুলোয় তো আরই রমরমা। প্রায় একশ বছর আগে এক বাঙালি সন্ন্যাসী, আচার্য্য প্রণবানন্দ স্থাপন করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ। দানধ্যানে এবং পরিকাঠামোগত কাজে তাদের সুনাম রয়েছে, দেশে বহু জায়গায় তাদের শাখা এবং ধর্মশালা, বিদেশেও কিছু স্থানে তাদের অফিস রয়েছে। তো তাদের সুনাম ভাঙিয়ে খাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক জালি সংস্থা নিউ ভারত সেবাশ্রম সংঘ, আদি ভারত সেবাশ্রম সংঘ ইত্যাদি নামে অফিস খুলে বসে গয়ায়। কমিশনের বিনিময়ে তাদের রেলস্টেশন থেকে অনেক রিকশা- অটোওয়ালা যাত্রী ধরে এনে দিত, যারা ভারত সেবাশ্রম সংঘ যেতে চাইত তাদের। একবার খাতায় নামধাম লিখিয়ে নিয়ে তারপর টাকার জন্য জোরজবরদস্তি। দুর্নীতিখ্যাত লালু- জমানায় বিহার প্রশাসন তেমন নজর দিত না। বিগত কয়েক বছরে এগুলোর উপর কড়াকড়ি হয়েছে।

বাঙালি তীর্থস্থানে গেলে আগে তাদের ধর্মশালাতেই উঠত, এখন পয়সা হওয়ায় হোটেলপাতি দেখে। যেহেতু আমাদের যাগযজ্ঞের কাজ আছে, এবং সব তীর্থস্থানেই পাণ্ডাদের জুলুমবাজির ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি, আমরা গিয়ে উঠলাম ওদের ধর্মশালাতেই– ওদের ব্যবস্থার পুরোহিতেরা ন্যায্য ব্যয়ে এবং কম ঝামেলায় কাজ সেরে দেবে। বিশাল চত্বর, ততোধিক বড়ো ধর্মশালা, দপ্তরেও তেমনই ভিড়। এক কোণে প্রায় তিরিশ- চল্লিশ জনের বড়ো দল এসেছে, বিয়ের আয়োজনের মতো বিশাল কড়াইতে রান্না করে নিচ্ছে তারা। খিচুড়ির গন্ধে সদ্য ট্রেনযাত্রা করে আসা ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত শরীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঘর খুবই ছোটো, অপরিচ্ছন্ন, আলোও জ্বলে না, তার মধ্যেই মালপত্র রেখে আমরা বেরোলাম পুরোহিতের সাথে ঘাটের উদ্দেশ্যে।

ঘাট বলতে ফল্গু নদীর ঘাট। অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী। পুরাণের গল্পে বলে, সীতার শাপে নাকি সে ভূতলগামী। এরকম গল্পের অভাব নেই– বিষ্ণুর বরে সচ্চরিত্র গয়াসুর যেখানে পাষাণে পরিণত হয় সে- ই নাকি গয়া। শীতকালে ফল্গুর চওড়া খাত শুকনো পড়ে আছে। তার থেকে একটু দূরে উঁচু পাড়ের উপর বিষ্ণুপাদ মন্দির। যে পা দিয়ে গয়াসুরের মাথায় স্পর্শ করেছিলেন তার পদচিহ্ন

রাখা রয়েছে মন্দিরে। পুণ্যার্থীরা গিয়ে সেথায় জল- ফুল- বেলপাতা ঢালে, একটু স্পর্শ নিতে হুড়োহুড়ি করে। হিন্দুধর্মের সব জায়গাতেই জল ঢালা, কাদা মাখা, সিঁদূরটিদূর লেপা, ফুল- পাতার অবশিষ্ট সব মিলিয়ে চরম নোংরা হয়ে থাকে। এসব অঞ্চলও ব্যতিক্রম নয়।

মন্দিরের পাশ দিয়ে একটা সরু গলি দিয়ে একটুদূর গিয়ে হলো ঘাট। ভালোই ভিড় হয়, সরকার দোতলা বাঁধানো চাতাল করে দিয়েছে সবার বসার জন্য। স্থানীয় জীর্ণ পোশাকের ছেলেপিলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর অগুনতি ভিক্ষুক। ভক্তিভাবের স্থানে দানধ্যান করে কিছু পুণ্য অর্জন করুন, তারপর তার কিছু অংশ পুরোহিতদের মাধ্যমে উপরে প্রেরণ করুন। ওনারা মন্ত্র পড়ে সব করতে পারেন। পূর্বপুরুষ গাভীর লেজ ধরে বৈতরণী নদী পার হয়ে পরলোকে যাবেন। সেই গাভী আপনার ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে দান করা বিধেয়। সে ব্যবস্থা করা কঠিন? কুছ পরোয়া নেই, নগদ অর্থ দান করুন, ওঁরা মন্ত্র পড়ে গরু সৃষ্টি করে নেবেন।

এমনই এক ব্রাহ্মণ সরু গলিটার একপাশে বসে রয়েছেন একটা ছোটো খুপরিতে দুটো পুতুল সাজিয়ে। লক্ষ্মী- নারায়ণের মূর্তি। সামনে দুচারটে গাঁদাফুল আর কয়টা পয়সা রাখা। পুরুতঠাকুরের শীর্ণ রুক্ষমূর্তি, গালে খোঁচা দাড়ি, পরণে ধুতির উপর নামাবলি। পাশ দিয়ে যে যাচ্ছে তাকেই চিৎকার করে বলছেন , “দক্ষিণা দেও!” আফসোসের কথা, কেউই আমল দিচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে কাছ দিয়ে যাওয়া এক বালিকার আঁচল ধরেই টান দিলেন, গজরগজর করছেন, “আরে, দেখতা নেহি, ভগওয়ান হ্যায়! দক্ষিণা দেও!” বালিকা ভ্রূকুটি করে আঁচল ছাড়িয়ে চলে গেলো। ব্রাহ্মণ কুপিত হয়ে হুংকার দিলেন, “ভ্রষ্ট্ হ্যায়!”

এঁদের জন্য মায়াই লাগে। পরিস্থিতি এদের অন্য কোনো কার্যকরী জীবিকার শিক্ষা দেয়নি, ধর্মকেই পুঁজি করে চলতে শিখিয়েছে। পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, সচ্ছলেরা আচারব্যবহার ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, দরিদ্রদের ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্য থাকে না দানধ্যানের। তার উপর ঘরে হয়তো রয়েছে বৃদ্ধ মা- বাবা, ব্রাহ্মণী, হয়তো আশপাশে ঘুরতে থাকাদের মধ্যে কয়েকটা কৃশকায় নাবালকও এনাদেরই।

(৫)

গয়া থেকে পরদিন আমার অনুরোধে যাওয়া হলো নালন্দায়। সেই নালন্দা। তক্ষশীলার পর ভারতের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। বৌদ্ধ ও হিন্দু শাস্ত্র, জ্ঞান- বিজ্ঞান, জ্যোতিষ- চিকিৎসাচর্চার কেন্দ্র। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্যযুগে, সম্রাট অশোকের সময়, শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে যার প্রতিষ্ঠা, গুপ্তযুগে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে যার প্রসার, পালযুগে নবম শতক নাগাদ যার খ্যাতি হ্রাসের আরম্ভ, এবং দ্বাদশ শতকে যার সমাপ্তি। নালন্দার সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছে দেখে পাল- রাজারা আরো চারটি বিহারের পত্তন করেন, যার মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি পায় বিক্রমশীলা মহাবিহার। এই বিক্রমশীলা বিহার এবং এর প্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ অতীশ দীপঙ্করের উপর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চমৎকার ঐতিহাসিক উপন্যাস আছে, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’।

ভারতের ইতিহাসে বিদ্যাচর্চা লালিত হয়ে আসত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়। আর দিল্লীর শাহেনশা কুতুবুদ্দীন আইবকের তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি ১১৯৩ সনে এই প্রাচীন কেন্দ্রে এসে চরমতম পৃষ্ঠপোষকতা করে গেলেন। এর সুবৃহৎ তিনটি গ্রন্থাগারে কোরানের কোনো খণ্ড আছে কি না, তা জিজ্ঞাসা করে অগ্নিসংযোগ করলেন এগুলিতে। লক্ষাধিক পুঁথিপত্রের সেই সংগ্রহ বহু মাস ধরে জ্বলতে থাকলো, নালন্দার আকাশ ধূম্রজালে আছন্ন করে। নালন্দার সেই ধ্বংসযজ্ঞ এবং হত্যালীলা যেমন ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রকে সরিয়ে নিয়ে যায় তিব্বতে, তেমনই ভারতজুড়ে প্রাচীন বিদ্যাচর্চার উপরেও ক্রমে অবক্ষয় নিয়ে আসে।

আর্কিওলজিকাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া পুরাকীর্তিগুলির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করে থাকেন। এই নালন্দাতেও তাঁরা ভগ্নস্তূপ খুঁড়ে প্রাচীন নির্মাণের অংশ যেমন বের করে আনছেন, তেমন সেই ইটপাথর দিয়েই মূল বাড়িঘরের অনুকরণে দেওয়াল- দালান- ঘর- মন্দির বানিয়ে ফেলছেন আবার। এই দ্বিতীয় অংশে আমার কিছুটা আপত্তি। অজন্তা- আলোচনায় নারায়ণ সান্যাল যেমন বলেছিলেন, যে দর্শকের বোঝার উপায় থাকে না, কতটা অংশ মূল ভগ্নস্তূপ থেকে অবিকৃত রাখা হয়েছে, আর কতটা কর্মীদের নিজেদের সৃষ্টি। নালন্দাতে কাজ চলছে

বহুদিন ধরেই, এখনও বহু মাটির ঢিবি খনন করা বাকি, খোদাই করা পাথরখণ্ড পড়ে রয়েছে ইতস্তত।

আমেরিকা মহাদেশকে ইউরোপীয়রা নাম দেন 'নিউ ওয়ার্ল্ড'। সেই মহাদেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়টি নগর কলকাতার থেকেও বেশ কিছু পুরোনো। এমন স্থান থেকে ফিরে আমি ভারত রাষ্ট্রের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখতে খুবই আগ্রহী ছিলাম। না, ঠিক তীর্থদর্শন নয়, অতীতবিলাসিতাও নয়, একটা দর্শনীয় ক্ষেত্র যেখানে আজ থেকে হাজার বছর আগে শিক্ষক ও ছাত্রসংখ্যায়, গ্রন্থসংখ্যাতেও, তুলনীয় এক শিক্ষাকেন্দ্র অবস্থিত ছিলো। আজ সেখানে রুক্ষ ইঁটের খুপরিগুলি অতীতের সহস্রাধিক ছাত্রদের আবাসগৃহের স্মারক, আগাছা-আচ্ছাদিত কূপগুলিতে গভীর অন্ধকার। দ্যোতক? আমি আনমনে ছবি তুলতে থাকি। প্রাচীর- তোরণ- চত্বরে মার্জারশাবকের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াই। শাসন করবার মতো কোনো অর্হৎ তো আজ উপস্থিত নেই।

"অ্যাই বাঁদর, আয় এদিকে!"

সুমিষ্ট সম্ভাষণে ফিরে দেখি, দূর থেকে মাতাশ্রী ডাক দিয়েছেন। কাছে গিয়ে দেখি, সবাই আলাপচারিতায় ব্যস্ত দুজন মহিলা ও এক ভিক্ষুর সাথে। মহিলারা সিকিম থেকে আসছেন নালন্দাদর্শনে, ওই ভিক্ষু একদা ওনাদের গ্রামেরই সন্তান ছিলেন, যত্ন নিয়ে দেখাচ্ছেন। শুনলাম, মহিলার একটিমাত্র মেয়ে, নিউইয়র্কে গবেষণারত কয়েক বছর। আমার মা- কে বারবারই বলছেন, হ্যাঁ, একমাত্র ছেলে বাইরে থাকে, আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট। সঙ্গের সেন- কাকিমাও এই প্রথম দুই ছেলেকে কলকাতার বাড়িতে রেখে বেরিয়েছেন, তিনিও সেই বিষাদালোচনায় খুব আবেগভরেই যোগ দিচ্ছেন। মহিলার তাই এনাদের খুব পছন্দ হয়ে গেছে, একসাথে ছবি তুলতে চান। তাই ক্যামেরাধারী আমাকে হাঁক দেওয়া। কিন্তু তিন সত্যি, তাঁর দুহিতার কোনোরূপ সুলুকসন্ধান তিনি আমায় দিতে উৎসুক ছিলেন না।

(৬)

গয়া থেকে যাওয়া হলো ভারতের এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন জনপদ কাশীতে। পরিচিতজনের ধর্মশালা ছিলো, বেশ সুসজ্জিত, সেখানে আস্তানা করা হলো। তারপর বেরোই খাদ্যের সন্ধানে। সাইকেলরিকশা- অটো- স্কুটার- গাড়ির জটলায় দুর্ভেদ্য কাশীর প্রাণ হলো অজস্র গলি এবং অগুনতি মন্দির। একেই বলে শুটিং- এ সত্যজিৎ যার দারুণ বর্ণনা দিয়ে গেছেন। সরু, আঁকাবাঁকা, অন্ধকার গলিতে ঘুরতে ঘুরতে আমরা পুরি- সবজি- জলেবি- পেঁড়া উদরসাৎ করি। শেষে মিষ্টি পান। আর হ্যাঁ, মালাই। শীতকালেই যার প্রশস্ত সময়। বিশাল মাটির পাত্রে জাফরান- সজ্জিত পেস্তা- ছড়ানো ফেনাদার মালাই। অধিক খেলেই দাস্ত, কিন্তু পরিমিত গ্রহণে হমীন অস্ত।

গঙ্গার ধারে ধারে পরপর অসংখ্য ঘাট। রাজারাজড়া- সন্ন্যাসীদের বানানো, আদিকাল থেকে। কত ইতিহাস তাদের। ঘাটের ধার বেয়ে উঠে গেছে চওড়া সিঁড়ি, ঘাটের গায়েই রাজা বা বেনিয়াদের প্রাসাদ। বিখ্যাত দশাশ্বমেধ ঘাট। ঘাটের উপর পাথরে বেদিতে পাণ্ডাদের আসন, তাতে পোঁতা কাশীর বিখ্যাত ছাতা। ইতস্তত বিচরণকারী কৃষ্ণবর্ণ ষণ্ড। লাগোয়া বাঁধা অনেক নৌকো। কুয়াশা

আর ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে কত ট্যুরিস্ট, কত বাচ্চা- বুড়ি- সাধুসন্ত পুণ্যস্নান করছে হিমজলে। এখানেও সিঁড়ির ধারে সারি সারি ভিক্ষুক। বাংলায় বয়স হয়ে গেলে কাশীবাসী হবার চল ছিলো, অন্যত্রও আছে। সেইসব সহায়সম্বলহীন পরকালের অপেক্ষায় বসে থাকা লোলচর্ম জীর্ণ দেহের সারি।

ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে যাই মণিকর্ণিকা ঘাটে। শবদাহের পবিত্র স্থান। এখানে শেষকৃত্য হলে অনন্ত স্বর্গলাভ। একের পর এক মৃতদেহ আসছে। সাদা কাপড়ে কি নামাবলিতে ঢাকা। চারপাই বা বাঁশের উপর চড়ে। চোখে তুলসীপাতা, গায়ে তিলক, ফুল ছড়ানো। শীতে যেন বয়স্করাই বেশি মারা যায়। আত্মীয়দের তাই বেশি শোক নেই। ঘাটের পাশে কাঠের বিশাল স্তূপ। একের পর এক চিতা তৈরি হচ্ছে। ডোমেরা তদারক করে। কুকুর ঘুরে বেড়ায়। রাজা হরিশচন্দ্র। হিমেল হাওয়ায় আগুনের শিখা হুহু করে উপরদিকে ধায়, বিদেহী আত্মার মতো। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়। নির্লিপ্ত আমি ছবি তুলি।

(৭)

তীর্থদর্শন সমাপ্তে আমরা ফেরার ট্রেন ধরি। উত্তর ভারতে শীতকালে ঘন কুয়াশা। ট্রেন বেশ লেট। তাও অবশেষে আসে, আমরা লটবহর নিয়ে চেপে বসি। ক্লান্ত রোমন্থন করি সময়গুলোর। অল্প কয়েকদিনের জন্য ঘরে ফেরা, তারপরেই আবার অন্য প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উড়ান। ব্যাগ থেকে সযত্নে বার করে দেখি, নালন্দার ভগ্নস্তূপ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটা ছোট্ট ইটের খণ্ড। দেড় হাজার বছরের প্রাচীন নিদর্শন। বাবাও দেখি আমার জন্য অমনই একটা টুকরো কুড়িয়ে এনেছিলেন। সেটাও সাথে নিই। লোকে কাশীর স্মৃতি হিসাবে মূর্তি আনে। নালন্দার স্মৃতিচিহ্নদুটো নিয়ে ফিরি আমরা। ধর্ম নয়, বিদ্যাই আমাদের পুণ্যভূমি।

মধুকাটা

মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

একে পূর্ণিমা তার উপর পাঁচ নাম্বার সতর্কসংকেত, জোয়ারের জোর স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি, মশা আর ঢেউয়ের তোড়ে দোবাকি থেকে চলে এসেছিলাম কলাগাছিয়া, সেখানেও টিকতে না পেরে বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন পেরিয়ে কলবাড়িতে খালের ভেতর আমরা, সেই খাল আবার আমাদের চিরচেনা বুড়িগঙ্গার ডাবল, ঢেউয়ের তোড় কম হলেও মশা এখানেও। রাত প্রায় দেড়টার দিকে হাতেটানা নৌকায় কুড়াল হাতে মোয়াজ্জেম উঠে আসে আমাদের ট্রলারে। ভেতরে সবাই তখন ঘুমাচ্ছে। ট্রলারের উপর আমি আর বাপ্পি ভাই বসে বসে পরদিনের পরিকল্পনা করছি।

মোয়াজ্জেম খবর দেয়, বলে, মামা খইলশাবুনির খালে চাক দেখে এসেছি, মণখানিক মধু হবে তাতে। ফিসফিস করে বাপ্পির কানে কানে বলে গতকাল সন্ধ্যায় মান্নানকে সেখানে দেখেছি দলবল নিয়ে বসে থাকতে, যাওয়াটা কি ঠিক হবে? বাপ্পি তাকায় আমার দিকে। আমি বলি কলাগাছিয়ার আশে পাশে চাক নাই? মোয়াজ্জেমের তড়িৎ উত্তর “আছে”। আমি তাকাই বাপ্পির দিকে। “ভাই সমস্যা, সরকারি হিসাবে চাক কাটা শুরু হবে এপ্রিলের ১ তারিখ থেকে, এই চাক কাটতে গেলে ফরেস্ট অফিসের ভেতর দিয়েই যেতে হবে, এখন আপনি দেখেন বন্দোবস্ত করতে পারেন কি না।”

এই বন্দোবস্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ভোর পর্যন্ত। মোয়াজ্জেমের সাথে কতজন যাবে, কীভাবে যাবে এসব টুকটাক আলাপ সেরে যখন ঘুমাতে গেলাম ঘড়িতে তখন রাত পৌনে তিন।ভোর ছয়টাতেই তিনটা কাঁকড়া ধরা নৌকায় ওরা এসে হাজির। আমাদের ট্রলারের পেছনে দড়ি দিয়ে নৌকা বেঁধে একসাথে চলে এলাম কলাগাছিয়া। ভাটা চলছে সে সময়। কলাগাছিয়া স্টেশন লাগোয়া একটা শুকনো খাল দেখিয়ে মোয়াজ্জেম জানালো এই পথে আধা কিলোমিটার দূরেই আমাদের গন্তব্য, খালে নৌকা ঢুকবে না বলে স্টেশনের ভেতর দিয়ে ঘুরে না মাড়ানো বন পেড়িয়ে সেখানে পৌঁছাতে হবে আমাদের। অবশ্য আমরা চাইলে ফেরার সময় এই খালেই নৌকা চালিয়ে ফিরতে পারবো। সহযাত্রীদের কাউকে চোখ বড়ো করে তাকাতে দেখে মুচকি হেসে মোয়াজ্জেম বললো "এ বড়ো আজব বন, মামা"।

ঘাটে ট্রলার ভেড়ানোতে সমস্যা হওয়ায় কাদামাটিতে লাফিয়ে নামলাম সবাই। সহযাত্রীরা তাদের ক্যামেরাপাতি ঠিকঠাক করার ফাঁকে ফরেস্ট অফিস থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতিও মিললো। আমাদের দুজন গার্ডের সাথে কলাগাছিয়ার একজনও যোগ দিলে মাথা গুনে দেখলাম আমরাসহ মোট ২৩ জনের বিশাল দল, বেরুবার সময় আবার এভাবেই মাথা গুনে বের হতে হবে আমাদের।

স্টেশনের ঠিক পেছনে ছোট্ট পুকুর, তার পাড়ে বানরের দল খেলা করে, সন্ধ্যায় হরিণ নেমে আসে পানি খেতে, সেই পুকুর পেরিয়ে খাল পাড়ে ছোট্ট খালি জায়গা, তাতে আটক করা বেশ কয়টা নৌকা অর্ধেক ডুবে আছে কাদায়, কেস শেষ হবার আগেই এদের শরীর মিশে যাবে মাটিতে।

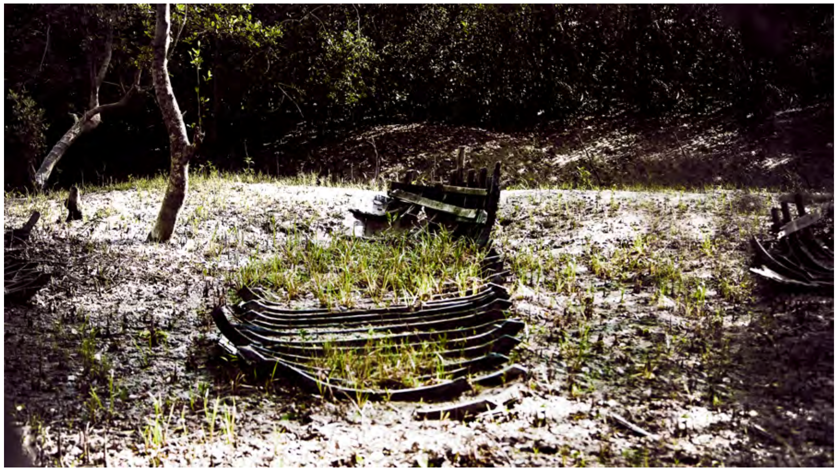

আমাদের দলনেতা শাজাহান, মোয়াজ্জেমের বাবা, বুড়ো শুধু খিকখিক করে হাসে। মাঝে মাঝে অজানা ভাষায় কথা বলে, তার দলের লোকেরা উত্তর দেয়। কিছু বুঝি কিছু বুঝি না। আমরা বনে ঢুকি, ওদের সাথে তাল মেলানো শক্ত, খালিপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। আমরা জুতাপায়েও বেরিয়ে থাকা শ্বাসমূলের খোঁচায় অস্থির, যতই ভেতরে যাই বন আস্তে আস্তে গভীর হয়, নানান জাতের গাছ, কিছু চেনা কিছু অচেনা, একসময় মাথাও নিচু করতে হয় ডালের বাড়ি ঠেকাতে। শুধুমাত্র সামনের জনের পা দেখে দেখে হাঁটি, চার পাঁচ হাত দূরের মানুষকেও ঠিক চোখে আনতে পারি না। দূরে একপাল হরিণ ছুটে যায়, আমরা

পায়ের শব্দ পাই, দুই একবার বনমোরগের ডাক শোনা যায়, এছাড়া পুরো বন নিঝুম, আগুয়ান দলটা সামনে একটা খোলা জায়গায় থামে, কুউউ ডেকে সঙ্গীদের খোঁজ নেয়। কেউ কেউ পিছিয়ে আছে, আমরা দাঁড়াই ওদের জন্য। আরেকবার মাথা গোনা হয়। এরই মাঝেই আগুন দেবার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

শুকনো কিছু গোলপাতা কাঁচা পাতা পেঁচিয়ে তৈরি হয় মশাল, গোলপাতায় আগুন দিলে ধোঁয়া হবে কাঁচা পাতায়, সেই ধোঁয়া চাকের উপর ফেলে মাছি সরানো হবে, এরপর কেটে নেওয়া হবে চাক। আমি ওদের প্রস্তুতি দেখি। শাজাহানকে আবার হাসতে দেখে জানতে চাই হাসেন ক্যান? এবারে মৌয়ালদের সবাই একসাথে হেসে উঠে। বলে চাক কাটতে এসে এত আয়োজন কখনও করে না ওরা, বড়োজোর একটা মশাল বানায়, দুজন ঢোকে, টুপ করে কেটে আনে চাক। এই আটটা মশাল শুধু আমাদের জন্যই। বছর দুয়েক আগে এক জাপানি পর্যটক দলের সাথে এসেছিলো ওরা। সে সময় ক্রুদ্ধ মৌমাছির আক্রমণ থেকে বাঁচতে পাশের খালে ডুব দিতে হয়েছিলো সবাইকে। আমি শিহরিত হই। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি খালে পানি বাড়ছে, লাফ দিয়ে সেখানে নামতে কত সময় লাগবে তার হিসাব করি।

ওদের সাথে হেঁটে এসে চাকটা দেখে এলাম, বেশ বড়োসড় একটা চাক, মধু এখনও জমেনি, শুনলাম কেজি বিশেক মধু হবে তাতে। ঠিক হলো আমাদের ছবি তোলার জন্য যা প্রয়োজন সবই করবে ওরা, আর চাক কাটতে বললাম অল্প একটু, অপুষ্ট চাক পুরোটা কাটতে ইচ্ছা হলো না। আমার সিদ্ধান্তে খুশি হয়ে শাজাহান এসে আমার কাঁধে হাত রাখলো। ষাট বছর আগে প্রথম যেদিন বনে ঢুকেছিলো সেই গল্প শুরু হলো, চমৎকার মানুষ শাহাজান, সরে যাবার আগে বললো "মামা, এ বন আমাদের ভাত দেয় আবার জীবনও কেড়ে নেয়, কতবার চেষ্টা করেছি অন্য কিছু করতে কিন্তু বনের মায়া অন্যরকম, একদিন না

ঢুকলেই মন অস্থির হয়ে উঠে"।

সূর্য উঠছে, তার আলো ছড়িয়ে পড়ছে গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে। কেমন এক অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা চারদিকে। আমরা সবাই গোল হয়ে চাকের গাছটা ঘিরে দাঁড়াই। শাহাজান বলে ধোঁয়া দেওয়া মাত্রই মাছি উড়ে যাবে, মাছি চাকে ফিরে আসার আগেই কেটে ফেলা হবে তা, ওরা ফিরে এসে চাক না পেলে আশেপাশে আক্রমণ চালাবে, সুন্দরবনের মৌমাছির আক্রমণে মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও শোনায় আমাদের। ধোঁয়া দেওয়া আর চাক কাটায় বড়োজোর মিনিটখানিক লাগবে শুনিয়ে বলে দেয় চাক কাটার সাথে সাথেই আমরা যেন নৌকায় উঠে বসি।

ওরা ততক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে, আমাদের সবার ক্যামেরায় বিরামহীন ক্লিকক্লিক শব্দ হচ্ছে। ওদের চারজন এগিয়ে গেলো চাকের দিকে, বাকিরা নৌকায়, মাটি থেকে দশ হাত উপরে চাক, মৌমাছির বিজবিজ শব্দ এখান থেকেও শোনা যায়। ধোঁয়া শুরু হলে আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকে মাছি, এরই মাঝে মাথা মুখে গামছা পেঁচিয়ে মোয়াজ্জেম উঠে গেছে গাছে। অদ্ভুত দক্ষতায় পেলব হাতের পরশে চাকের উপর থেকে মাছি সরিয়ে দিতে থাকে মোয়াজ্জেম, চারদিকে ভনভন করছে মাছি, একসময় দেখলাম যে ডালে চাক লেগে আছে তার উপর হাত পা মেলিয়ে শুয়ে পড়েছে সে। ঠিক তখনই নিচ থেকে গামলা ধরা হয় চাক বরাবর, টুপটুপ করে দুই টুকরা চাক কেটে নেমে আসতে আসতে আমাদের তাড়া লাগায় নৌকায় উঠবার। আমাদের চারদিকে ভনভন করা মাছিগুলো চাক ঘিরে গোল হয়ে চক্কর দিতে থাকে, নৌকায় উঠার আগে শেষবার মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম ওরা ফিরে গেছে আবার চাকে।

আমরা ফিরে চলছি, কিছুক্ষণ আগে দেখা শুকনো খালে টইটুম্বুর পানি বনের অনেক ভেতর পর্যন্ত চলে এসেছে। পাতার আড়াল থেকে নেমে আসা আলোয় সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মাথা ছুঁয়ে যায় ডাল, এরই মাঝে মাথা নিচু করে অদ্ভুত দক্ষতায় তরতর করে এক বৈঠার নৌকা এগিয়ে চলে আমাদের ট্রলারের পানে।

পুনশ্চ: আমরা এই চাক কেটেছিলাম মার্চের উনিশ তারিখ। তার কিছুদিন পর মার্চের ৩১ তারিখ একই চাক কাটতে এসে মৌমাছির আক্রমণের শিকার হয়ে আহত হয়েছে ১০/১২ জন, চার জন বাংলাদেশি টিভি ক্রুকে হসপিটালে ভর্তি করতে হয়েছে।

তিন বিঘা গ্রামে

নীড় সন্ধানী

১.

- চ্যাংরাবান্দা যাইতেছি কালকে, যাবি তুই?

- জায়গাটা কই?

- উত্তরবঙ্গে, লালমনিরহাট সীমান্তে।

- নাহ চিনতেছি না, ভূগোল সিলেবাসে আছিলো না।

- আমিও চিনি না। তয় শুনছি বাংলাদেশে যেইটা বুড়িমারি, ভারতে সেইটাই চ্যাংরাবান্দা।

- বুড়িমারিও শুনি নাই।

- কস কী? এইটা তো বিখ্যাত জায়গা! শিলিগুড়ি দার্জিলিং যাওয়া যায় এই পথে। অপুরা চলে যাচ্ছে শেষমেষ। ওদের বর্ডারে পৌঁছে দিতেই যাচ্ছি সবাই।

- তাই নাকি? কি হইছে অপুদের?

- বিরাট সমস্যা হইছে। তোরে পরে কমু।

২.

তিতিবিরক্ত শিক্ষাজীবনের শেষ পরীক্ষাটা দিয়ে ঢাকার বাসে চড়ে বসি ৯৫ সালের জুন মাসের দিকে। ঢাকায় সাব্বিরের বাসাটা ছিলো আমাদের আন্তঃজেলা আড্ডাখাড্ডার - রাজধানী। বিশ ফুট বাই বিশ ফুটের বিশাল ব্যাচেলর বেডরুমের কার্পেটে দিনরাত আড্ডাও, খাও, ফুঁকাও, উড়াও, কোনো সমস্যা নাই। চার দিন ম্যারাথন আড্ডা শেষে ফেরার আগের রাতে সাব্বির বললো চ্যাংরাবান্দার কথা।

৩.

বাংলাদেশের ম্যাপের উত্তর- পশ্চিম কোণে যে তিনটি সুঁচালো মাথা বেরিয়েছে তার মাঝখানের টিলার শীর্ষবিন্দুটির নাম বুড়িমারি। সেই বুড়িমারির ভারতীয় অংশের নাম চ্যাংরাবান্দা। ভারতে যাবার একটি অন্যতম স্থলবন্দর। হিমালয় পর্বতের খাড়াইগুলো নামতে নামতে যার কয়েক মাইল উত্তরে এসে থেমে গেছে দিগন্তের সেই শেষ প্রান্তে মেঘমুক্ত আকাশে মাঝে মাঝে কাঞ্চনজংঘার শ্বেতশুভ্র চূড়াটা উঁকি দেয়। ভাগ্য প্রসন্ন হলে ওটাও দেখতে পারি বুড়িমারি গিয়ে।

৪.

পরদিন বিকেলে বাস ছাড়লো গাবতলী থেকে। তখনো যমুনা সেতু হয়নি। লালমনিরহাটগামী যে বাসটিতে আমরা উঠলাম সেটি ছিলো একটা লোকাল বাস। ঠাসাঠাসি ভিড়। দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। বারো থেকে আঠারো ঘন্টা পর্যন্ত লাগাতে পারে পৌঁছাতে। দীর্ঘ ক্লান্তিকর একটা ভ্রমণ শুরু হলো। ফেরীতেই লাগলো তিন ঘন্টা।

মাঝ রাতে রংপুর ফেলে আসার পর একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। কী একটা সেতু পেরুনোর পর সম্ভবত তিস্তা), এতদিন পর সঠিক মনে নেই(বাসটা থেমে গেলো মাঝপথে। রাত দুটো বাজে তখন। নিঝুম নির্জন এলাকা। বাসের যাত্রীরা এতক্ষণ গল্পগুজবে মত্ত ছিলো। এখানে পৌঁছে সব চুপ। বিরান সেই অন্ধকারে আশেপাশে কোনো লোকালয় নেই। জানা গেলো সামনের রাস্তাটা ভালো না। প্রায় দশ মাইলের মতো রাস্তায় সর্বহারা ডাকাতের রাজত্ব। একা কোনো গাড়ি পার হয় না রাতের বেলা।

আরো গাড়ি আসলে সবাই লাইন ধরে একসাথে চলবে আর সামনে থাকবে পুলিশের এসকর্ট ভ্যান। আশ্চর্য, বাংলাদেশে এরকম ভয়ংকর জায়গাও আছে যেখান দিয়ে একটা বাস একা পেরুবার সাহস পায় না। বাসের ভেতর দাঁড়ানো লোকগুলো প্রায় সবাই খালি গায়ে। রংপুর থেকে উঠেছে দল বেঁধে। শ্রমিক হতে পারে। তবে খালি গায়ে কেউ গাড়িতে চড়তে পারে আমার জানা ছিলো না।

পুরো বাসে সাহেবি যাত্রী বলতে আমরা আটজনই। নানা রকম অতিকল্পনা ভর করতে থাকে। রংপুর থেকে ওঠা খালি গায়ের কালো কালো লোকগুলোকে ডাকাত বলে সন্দেহ করা শুরু করছে আমাদের কেউ কেউ। ওরাও হয়তো সেরকম মনে করছে আমাদেরকে। কে কার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কখন ঠিক নেই। আমাদের একজন ক্যামেরা লুকালো, আরেকজন মানিব্যাগ মোজার ভিতর ঢুকালো।

প্রায় আধা ঘন্টা পর আরো কয়েকটা বাস এলে পুলিশের গাড়িকে অনুসরণ করে বাসগুলো ছাড়লো। এতক্ষণ ভয় লাগেনি, কিন্তু পুলিশ দেখে বিপদের গুরুত্বটা বেড়ে গিয়ে ভয়টা চেপে ধরলো।

দুপাশের ঝিঁ ঝিঁ ডাকা অন্ধকারে সতর্ক চোখ আমাদের। দেখছি কোনো নড়াচড়া আছে কি না। এই রাস্তার দুপাশে অন্তত পাঁচসাত মাইল কোনো জনবসতি - নেই। বিশাল প্রান্তর চিরে বেরিয়ে গেছে রাস্তাটা। এলাকাটা একেবারে জনবিরল। সামনে পুলিশের গাড়ির দিকে তাকিয়ে জবুথবু দুহাতে বন্দুক জড়িয়ে থাকা সেপাইদের বসে থাকতে দেখে মায়া হলো। মনে হলো হাতের বন্দুকগুলো ওদের বোঝা বাড়ানো ছাড়া তেমন উপকারে আসে না। হয়তো গুলিও নেই ভেতরে। সত্যি সত্যি সামনে সর্বহারা ডাকাতদল পড়লে ওরাই হয়তো সবার আগে দৌড়ে পালাবে অন্ধকারে।

পনেরো মিনিট পর আমাদের ক্যাফেলা একটা মোড়ে পৌঁছালো। ওখান থেকে একটা পথ কুড়িগ্রাম, আরেকটা লালমনিরহাটের দিকে চলে গেছে। এখান থেকে বাকি পথ নিরাপদ। হাঁপ ছেড়ে লালমনিরহাটের পথ ধরলাম।

পাটগ্রামে যখন বাসটা ঢুকছে অন্ধকার কেটে ভোরের আলো ফুটছে তখন। আবছা আলোয় কেমন একটা পরিত্যক্ত শহরের মতো লাগলো দেখতে জায়গাটা। লোকজন তেমন নেই রাস্তায়। ভ্যানগাড়ি দেখা গেলো দুয়েকটা। একেবারে বুড়িমারি সীমান্তের কাছেই বাসের অফিস। বাসের শেষ যাত্রী আমরাই। যেই কোম্পানির বাসে করে গিয়েছি সেই বাসের কনডাক্টরের সাথে খাতির করে রাতটা ওদের অফিসের পেছনের একটা ঘরে কাটাবার ব্যবস্থা হলো।

পরোটা, ভাজি, আর চা দিয়ে নাশতা সেরে বেরুলাম সীমান্ত দেখতে। আমাদের থাকার আস্তানা থেকে সোজা নাক বরাবর একটা রাস্তা চলে গেছে। ওদিকে কয়েকশো গজ পরেই সীমান্তের গেট। এখানে রাস্তাগুলো ভীষণ পরিষ্কার, সুন্দর। দুপাশে সারিবদ্ধ গাছ লাগানো। হেঁটে হেঁটে সীমান্তের যেখানে বাংলাদেশের পিলার দুটো দাঁড়িয়ে ওখানে থামলাম। কে জানি নিষেধ করলো ওখানে দাঁড়াতে। নো ম্যানস ল্যান্ড। মানুষের জীবনে স্বেচ্ছায় নো ম্যানস ল্যান্ডে দাঁড়ানোর সুযোগ খুব বেশি আসে না। তবু নিষেধ শুনে সরে আসতে হলো।

বামপাশে কাস্টমসের অফিসঘর। ডানদিকে সুন্দর একটা নদী। ওটার এপাশ বাংলাদেশ, অন্যপাশ ভারত। নদীটা এত সুন্দর পরিষ্কার টলমলে জল। এরকম কল কল করে চলা নদী ঢাকা চট্টগ্রামে দেখিনি। পাহাড়ি নদী, ভারতের হিমালয় থেকে বরফগলা জল বয়ে আনছে এই সমতলে।

৫.

ফিরে আসছিলাম। কিন্তু কাস্টম অফিসারের দরজায় দাঁড়ানো একটা মুখ দেখে থমকে গেলাম। বুকের ভেতর ড্রাম বাজতে শুরু করলো। স্মৃতির স্পুল পেছনে ঘুরতে ঘুরতে একজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেলো। তিন বছর আগের ঘটনা। ভুলটা এখন ভাঙাবার সুযোগ আছে কি? নইলে সারাজীবন ক্ষতটা থেকে থেকে যন্ত্রনা দেবে না !

এখানে কেন সে? যখন ভাবছিলাম, অবাক দুটি চোখ নিয়ে সে নিজেই এসে দাঁড়ালো সামনে।। আগের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বলতা আর ব্যক্তিত্ব চেহারায়। বয়স বাড়াতে সৌন্দর্যও যেন আরো খুলেছে।

- আরে আপনি এখানে? আমাকে বিদায় দিতে এসেছেন নাকি?

- আরে ... আপনি? কোথায় যাচ্ছেন আপনি? কীসের বিদায়?

- চলে যাচ্ছি।

- চলে যাচ্ছেন মানে?

- যেতে হচ্ছে, শ্বশুরবাড়ি ওই পাড়ে।

- আপনার বিয়ে হয়ে গেছে আপনার?

- কবেই হা হা হা ......

- জানতাম ...

- জানার কথা না।

- ভালো আছেন আপনি?

- আছি।

- কে যাচ্ছে সাথে?

- ভাশুরের ছেলে।

- বর কোথায়?

- তিনি যথাস্থানে, কোলকাতায়।

- ওখানেই থেকে যাবেন? আসবেন না আর?

- আসবো? কেন আসবো? কার কাছে আসবো?

- মাসিমা...

- মা তো নেই।

- নেই???

- না, ছমাস আগে গেলো। আমার এখন কিছুই নেই এখানে, বিন্দুমাত্র পিছুটান নেই, মুক্ত স্বাধীন আমি।

- খুব দুঃখিত। আপনারা শহর ছেড়ে চলে যাবার পর, আর যাওয়া হয়নি মাসিমাকে দেখতে। ঠিকানা ছিলো না।

- হুঁ।

- অনেক বছর পর দেখলাম আপনাকে।

- অনেক? হা হ হা ...

- হাসছেন কেন?

- হাসছিতিন বছর তিরিশ দিনকে অনেক বছর মনে হলো আপনা ,র!

- এত মুখস্থ আপনার?!

- থাকবে না? আমাকে সম্মানিত করার বিশেষ দিনটা ভুলি কী করে!

- এখনো রেগে আছেন?

- নাহ রাগ নেই, মনে রেখেছি, কেন যে মনে রাখি ...

- সেদিন আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি ভুলটা ভাঙাতে চাই আজ।

- প্লিজ, থাক ওসব। আমি ভুলে গেছি সব। আপনিও ভুলে যান।

- না। আমি একটা সুযোগ চাই।

- আর কোনো সুযোগ নেই ,জনাব। তীর ছুটে গেছে ধনুক থেকে, ওটা ফেরত আনার কোনো উপায় নেই। চাইলেও আমি এখন তিন বছর তিরিশ দিন আগে ফিরতে পারবো না।

- জানি, আমি ভুল করেছিলাম।

- আমাকে এখন যেতে হবে। আপনি ভালো থাকবেন।

- আপনার সাথে আর দেখা হবে না কখনো? আপনার কোলকাতার ঠিকানা, ফোন

- না, এসব কিছুই জানি না আমি, দরকারও নেই, যোগাযোগ বিড়ম্বনা বাড়ায়।

- আমার খুব খারাপ লাগবে আপনি সারাজীবন আমাকে ঘেন্না করে যাবেন।

- আপনাকে ঘেন্না করার উপযুক্ত ভাবেন? আমার ঘেন্না পেতেও যোগ্যতা লাগে, সে যোগ্যতা আপনার নেই। আমি ঘেন্না করি নিজেকে, এই আমাকে। ওই অপমানের পরও আমি এখনো কী করে প্রতিদিন গুনে গুনে মনে রাখি আমি একটা বিস্ময় হারিয়ে ফেলেছি কবে কোনো অবেলায়। আমি একটা বিস্ময়কে ভালোবেসেছিলাম। সেই বিস্ময় আমার ভালোবাসাকে অপমান করেছিলো। আমি সেই অপমানবোধের জ্বালা বয়ে নিজেকে ঘেন্না করে যাবো আজীবন।

- আমি একটু বলি। কেন অমন হয়েছিলো সেদিন খুলে বলি।

- না, আর কিছু বলার দরকার নাই। যা গেছে গেছে, লেট বাইগন বি বাইগন। তবে একটা ভীষণ অবাক লাগছে জানেন। এই একটু আগেও ভাবছিলাম, এই দেশে ফিরবো না কখনো আর। যাবার আগে কাউকে শেষবার দেখতে চাইলেও পারবো না আর। চট্টগ্রাম এখান থেকে অনেক দূর। ফোন করে খবর দিলেও দুদিন লেগে যাবে পৌঁছাতে। হাতে আছে মাত্র দুঘন্টা। কীরকম অসম্ভব ব্যাপার। অথচ দেখুন আপনি ঠিক সময়েই এসে হাজির। কেমন আলৌকিক মনে হচ্ছে সবকিছু। আশ্চর্য না?

- এটা সত্যি আশ্চর্য!

- আরো আশ্চর্য, আপনার জন্য আমার ভেতর পুষে রাখা কষ্টটা অবিকল এক রয়ে গেছে। এই কষ্টের নাম কী জানি না। বিশ্বাস করুন এই কষ্ট প্রেম নয়, ঘেন্নাও নয়। আমার সব প্রেম আমার বরের জন্য। আমাদের প্রেমের বিয়ে। কিন্তু আপনার জন্য একটা আজব কষ্ট বয়ে নিচ্ছি। একটা বিস্ময় নষ্ট হবার কষ্ট। আমি সত্যিই কখনো চাইনি আপনাকে ঘিরে ওই বিস্ময়টা হারাতে।

- আপনার কোলকাতার ঠিকানা কি সত্যি দেবেন না?

- না, ওটি হবে না। আমি খুব দুঃখিত। আমার বর্তমান জীবনটা আমি নষ্ট করতে পারবো না। আমি খুব সুখী এখন।

- একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

- করুন।

- আমাকে তুমি বলার সাধটা কি একেবারেই মরে গেছে?

- হাসির কথা বললেন জনাব।

- আমি কিন্তু তুমি বলেছিলাম সেদিন।

- কেন ওসব নিয়ে খোঁচাখুঁচি করছেন খামাকা, গেছে দিন গেছে।

- জানতে ইচ্ছে করলো হঠাৎ।

- যা নেই, তা খুঁজে কাজ নেই।

- ঠিকাছে।

- আসি আমি, আপনি ভালো থাকুন, সুখে থাকুন।

- তুমিও ভালো থেকো

- হা হা হা হা হা হা ‘সেই তুমি’? আসি এখন। গুডবাই।

- গুডবাই নী...

৬.

দূর থেকে সাব্বির লক্ষ্য করছিলো আমাদের। ওরা সবাই একটা টং ঘরের সামনে বসে ধোঁয়া ওড়াচ্ছিলো। আমি কাছে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। সাব্বির আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলো। আমি চুপচাপ বসে থাকলাম আরো কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, চল যাই। ফেরার পথে এক ভ্যানওয়ালা জানালো বললো তিনবিঘা করিডোর নাকি খুব কাছেই। চাইলে যেতে পারি। গেটটা একঘন্টা পর পর আধঘন্টার জন্য খোলে দিনের বেলা। ভ্যানগাড়িই যাওয়া যাবে।

তিনবিঘা করিডোরপড়েছে এটা নিয়ে কতো জাতের খবর !, এখন সরাসরি দেখার এরকম বিরল একটা সুযোগ পাবো এখানে এসে চিন্তাই করিনি।

দেরি না করে দুটো ভ্যান ভাড়া করে ছুটলাম। যেতে হবে পাটগ্রাম হয়ে। যেতে যেতে বিশাল প্রান্তর পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম কাঁটাতার ঘেরা সীমান্তে। গেট বন্ধ এখন। ভ্যানওয়ালা জানালো আরো এক ঘন্টা পর খুলবে। এখানে একটা কেমন অস্বস্তিকর পরিবেশ। ভীষণ কড়াকড়ি। ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের পোস্ট দেখলাম করিডোরের মাঝখানে। ওদের মধ্যে রণসজ্জা, যেন এই মুহূর্তে যুদ্ধ বেধে যাবে।

আর আমাদের বিডিআর পোস্ট অনেকটা ভেতরে হওয়াতে তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া মুশকিল। ওপাশে বাংলাদেশ এপাশেও বাংলাদেশ। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ঝকঝকে ভারতীয় রাস্তা। ভারতের ওই অংশটার সাথে বাংলাদেশের পার্থক্যটা বেশ পরিষ্কার। বাংলাদেশ অংশটা ভীষণ দরিদ্র মনে হলো।

আমরা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম তিনবিঘা করিডোর। ওপাশে একটা বাংলাদেশ আছে যেটা আক্ষরিক অর্থেই বন্দিশালা। কেউ ইচ্ছে করলেই ওখান থেকে যখন তখন চলে আসতে পারবে না মূল ভূখণ্ডে। রাতে যদি কেউ মরেও যায় গেট খুলবে না। হাসপাতালে নেবার দরকার হলেও পরদিন ভোর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এসব কড়াকড়ি ভারতীয় তরফ থেকে। আমরা ভ্যানওয়ালার কাছ থেকে এসব তথ্য পাচ্ছিলাম, আর বিষণ্ন হয়ে পড়ছিলাম।

এমন সময় একটা বিকট চিৎকার এলো ওপাশ থেকে। তাকিয়ে দেখি মাঝের বিএসএফ পোস্ট থেকে বন্দুক উঁচিয়ে ইশারায় আমাদের দূরে সরে যেতে বলছে। ভ্যানওয়ালা বললো এখানে দাঁড়ানো নিষেধ। এই গেট ওদের। গেটের জায়গাটুকুও ওদের। আমরা গেটের এক ফুটের ভেতর চলে গেছি তাই গেট থেকে তফাত যেতে বলছে ওই সৈনিক। সরে গেলাম। কিন্তু এত রুদ্রমুর্তির কারণ কী। আচরণটা ভালো লাগলো না।

সরে গিয়ে পাশের খোলা প্রান্তরের ঘাসগুলো মাড়িয়ে হাঁটতে লাগলাম । ভারতীয় কাঁটাতার থেক দুই ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হলো। আমাদের তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে বিএসএফের বন্দুকের নল। দেখে মেজাজ এমন খারাপ হলোহঠাৎ এক ! বন্ধু বললো, আমার পেশাব করতে হবে। দাঁড়া বাংলাদেশে , দাঁড়িয়ে ইন্ডিয়ার কী করে বৃষ্টি ঝরাই দেখ।

বন্ধুর সাহস দেখে আমরা তাজ্জব হলেও সাহসটা ছিলো সংক্রামক। হুমকি আছে জেনেও জিপার খুলে বাকিরাও লাইনে দাঁড়িয়ে গেলো। আইন মেনে কাঁটাতার থেকে দুই ফুট দূরে দাঁড়িয়ে সীমান্তের ওইপারে জল ঝরাচ্ছে একদল বেপরোয়া তরুণ। বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে ভারতে জলত্যাগ। একটা অহিংস প্রতিবাদ, ভারতীয় সহিংস হুংকারের প্রতিবাদে। যেকোনো মুহূর্তে একটা হুংকার বা গুলি ছুটে আসতে পারে। কিন্তু সবাই ক্ষেপে আছে। শালার যা হবে হোক। এই কাজ দেখিয়ে যাবো তোদের। আশ্চর্য এবার কোনো হুংকার এলো না। সম্ভবত আইনগত দূরত্ব মেনে করার জন্যই।

গেট খোলার সময় হলো। আমরা লাইন ধরে দাঁড়ালাম। করিডোরটা বোধহয় একশো গজের মতো হবে। করিডোরে প্রবেশ করে আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে পেরোচ্ছি ভারতীয় অংশটা। অদূরে বিএসএফ সৈনিকদের হেলমেট পরা মুখ আংশিক দেখা যাচ্ছে বালির বস্তার পেছনে, সাবমেশিনগানের নলের পাশে। আবারো একটা চিৎকার। আরে মুশকিল, এখন সমস্যা কী তোর, চিল্লাস

ক্যা? কী বললো বুঝলাম না। কিন্তু হিন্দিতে চিৎকার চলছেই। একজন বুঝলো, বললো এত আস্তে হাঁটলে নাকি চলবে না। দৌড়ে জোর কদমে পেরিয়ে যেতে হবে জায়গাটা। হেলে দুলে হাঁটার কোনো অবকাশ নেই। আজব ! আমার আধঘন্টায় আমি যেমন খুশি তেমন করে পেরুবো। তাতে তোদের কী? কিন্তু না, আধঘন্টা আমাকে দেওয়া হয়েছে জরুরি গতিতে পেরুবার জন্য। আয়েশ করে নয়। হেলেদুলে চলা এই জায়গায় নিষিদ্ধ। মেজাজ আবারো টং হলো সবার। এ কোনো জাতের কথা? কী রকম চুক্তি হলো এটা? দুজনরে সমান সমান ব্যবহার করার কথা শুনেছি এতদিন। এখন এসব কী? পুরোটাই তো ওদের নিয়ন্ত্রণে। আমাদের কিছু করার নেই।

অবশেষে পা রাখলাম অন্য বাংলাদেশে। এটা একটা ভূমিদ্বীপ। আঙরপোতা দহগ্রাম নামে দুটি গ্রাম এখানে। চা দোকানের টুলে দুটো বাংলাদেশী পুলিশকে লাঠি হাতে বসে থাকতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, সারাক্ষণ এই হুমকির মধ্যে থাকেন কী করে আপনারা, ভয় করে না? উত্তরে বললো, ওদের ভয় বেশি তাই এত হুংকার করে। ওদের মেশিনগানের সাথে আমাদের এই লাঠিই যথেষ্ট। লোকটা রসিকতা করছে কি না বোঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সিরিয়াসই মনে হলো। ওখানকার বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে এটা দেখেছি। আমি ভাবতাম ওরা ভারতীয় বাহিনীর ভয়ে জবুথবু হয়ে থাকে সারাক্ষণ। কিন্তু দেখলাম লোকজন একটু বেপরোয়া রকমের সাহসী। হতেই হয় বোধহয়, নইলে টিকতে পারবে না। দেখলাম ওরা থোড়াই কেয়ার করে বিএসএফের হুংকার ধমক। সীমান্ত অঞ্চলের মানুষের দেশপ্রেমের জোর কি বাকিদের চেয়ে একটু বেশি?

গেটটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো ভেতরে ঢোকার কিছুক্ষণ পরেই। আরো এক ঘন্টা ফেরা যাবে না। আঙরপোতার আরেকজন মানুষের সাথে কথা হলো। তিনি বললেন, বাংলাদেশ অংশে চাষের কাজ করেন তিনি। দুপুরে তার নয় বছরের মেয়েটি ভাত নিয়ে যায় ক্ষেতে। গেট বন্ধ হয় একটায়, মেয়েটা তার আগেই খাবার দিয়ে যায়। মেয়েটা যদি কখনো এক মিনিট দেরি করে, তাহলে তাকে এক ঘন্টা না খেয়ে বসে থাকতে হয়। তখন বাপ এই প্রান্তে, কন্যা ওই প্রান্তে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। কতবার ঘটেছে ওরকমএখন গা সওয়া ! হয়ে গেছে। তবে রাতে কোনো বিপদ হলে সমস্যা। ভোর না হওয়া পর্যন্ত মরে গেলেও গেট খুলবে না।

গেট খোলার সময় হলো। ফিরে যাবো। উঠলাম আমরা। হেঁটে পেরিয়ে গেলাম তিনবিঘা করিডোর। ওপারে পৌঁছে ফিরে তাকালাম দেশ বিচ্ছিন্ন গ্রামকন্যা এক টুকরো ভূমিদ্বীপের দিকে। কী অদ্ভুত জীবন এখানকার মানুষের! স্বাধীনতার মানেটাই অন্য রকম। ওখান থেকে যখন খুশি তখন চাইলেই বাংলাদেশকে ছুঁতে পারে না কেউ। ওই অচ্ছ্যুত বাংলাদেশটার জন্য আমার মনটা কেমন করে উঠলো।

পরদিন ঢাকা ফিরে আসার সময় চোখটা ঝাপসা হয়ে আসছিলো বারবার। কী একটা চিরতরে ফেলে চলে যাচ্ছি এখানে।

বিলাত যাত্রা, সকলের দোয়াপ্রার্থী

নৈষাদ

২১শে জুন। বৃহস্পতিবার। সকাল ৭ টার মতো বাজে।

‘আচ্ছা, আইরিশ- পাবটা ঠিক কোথায়?’ - কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর এক বিমানবন্দর কর্মীর কাছে জানতে চাইলাম। সুবেশা এবং সুদর্শনা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আয়ত চোখে অবাক প্রশ্ন, ‘নাও! ডোন্টিউ থিংক ইট’স অ্যা লিটল টু আর্লি টু স্টার্ট?’ কিছুক্ষণ লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। অবশ্য আমাকে পুরাপুরি দোষ দেওয়া যাবে না। গোমড়ামুখো ইমিগ্রেশন অফিসারের পর দ্বিতীয় জনের কাছে এমন রস আশা করিনি। আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম: ‘রাইট। ইতিমধ্যেই দেরি হয়ে গেছে...জিএমটির হিসাবে...’। বিলেত যাওয়ার প্রস্তুতি হিসাবে বারবার দেখা নটিং- হিল এবং ফোর- ওয়েডিং- অ্যান্ড- অ্যা- ফিউন্যারালের কল্যাণে যে কোনো কথা শুরু করি ‘রাইট’ দিয়ে।

পড়াশোনা শেষে চাকুরিতে নতুন। বৃহত্তর সিলেটে বড়ো হয়েছি, লন্ডন দেখবো না হয় নাকি? লন্ডন পর্যন্ত সহযাত্রী হয়েছে সহকর্মী এক ইংলিশ যুবক, যার গন্তব্য সান্দারল্যান্ড নামের উত্তরের এক শহর। বিশ্বকাপ পর্বে ইংল্যান্ড- ব্রাজিল ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে আজ সকালে। লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরে বিমান থামার সাথে সাথেই ব্রিটিশ পতাকা পিঠে বেঁধে অন্য অনেকের সাথে আমার সহকর্মীও হৈ হৈ করে নেমে চলে গেলো। ব্রিটিশ ফুটবল জাতীয়বাদ। বলে গেলো ইমিগ্রেশন ফরম্যালিটি শেষ করে যাতে ‘আইরিশ পাব’- এ দেখা করি। ওখানে খেলা দেখে একসাথে শহরে যাওয়া যাবে।

আইরিশ পাবে গিয়ে দেখি টেলিভিশনে খেলা দেখার বিশাল আয়োজন। পাবভর্তি দর্শকের সবাই ইংল্যান্ডের পাঁড় সাপোর্টার। শুধু একজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক বিশাল চিল্লাচিল্লি করে ব্রাজিলকে সাপোর্ট করছে (পরে জেনেছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের)। কৃষ্ণাঙ্গ কথাটা আলাদা করে বলার কারণ হলো আমি ও তিনি ছাড়া সেখানে বাকি সবাই শ্বেতাঙ্গ। আমি কুৎসিত আইরিশ বিয়ার গিনেসের বিশাল এক গ্লাশ নিয়ে চুকচুক করে চুমুক দিচ্ছি। এই খেলায় আমি প্রায় দলনিরপেক্ষই বলা যায় (নারে ভাই, আর্জেন্টিনাও না), হয়তো হালকা ইংল্যান্ড সাপোর্টও করছি এই প্রত্যাশা থেকে যে জিতে গেলে তো আজ ‘মচ্ছব’ চলবে। ব্রাজিলের সাপোর্টার যুবক আমাকে তার দলে ধরেই নিয়েছে, প্রতিটি উচ্ছ্বাসের পর আকর্ণবিস্তৃত হাসি নিয়ে আমাকে বুড়ো আঙুল দেখায় আর বলে, ‘ম্যানননন...’। অনেকের মতো মাটিতে, দরজার কাছাকাছি। ব্রিটিশ ফুটবল সাপোর্টারদের ‘রেপুটেশন’ কিছুটা জানা আছে। মারধর শুরু হলে দৌড় দেওয়া যাবে। হার যখন নিশ্চিত, তখন টেনশন আরও বাড়লো।

আগেই ঠিক করে এসেছি পরিচিত কারো কাছে থাকবো না– একেবারের ভ্রমণের থিম ‘নিজের চোখে বিলেত দেখুন’ এবং ‘রঙের খনি যেখানে দেখবো রাঙিয়ে নেবো মন’। ইন্টারনেট ঘেঁটে আগেই নিশ্চিত ছিলাম ‘ইয়ুথ হোস্টেল’- এ থাকা ছাড়া সাধ্যে কুলাবে না। গ্যাটউইক বিমানবন্দরে ৫ পাউন্ড দিয়ে পছন্দমতো জায়গায় ইয়ুথ হোস্টেল বুক করা যায়। ইংলিশ সহকর্মী বললো কোনো ব্যাপার না। উই উইল সর্ট ইট আউট।

অবশ্য পরিচিত লোকজনকে না জানিয়ে বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক আপত্তি ছিলো। লোকজন শুনলে ‘মাইন্ড’ করবে, ‘একটু জানিয়েও গেলো না ছেলেটা’! ‘কারও বাসায় থাকলে তোমার সমস্যা কী’? এই প্রশ্নের আসলে কোনো সন্তোষজনক উত্তর নেই। সমবয়সিরা আরও কানমন্ত্র দিলো – একাএকা, কী না কী করে। শেষমেষ বললাম, যাওয়ার পর যদি লোকজন বেশি মাইন্ড করে তবে পত্রিকাতে ছবিসহ একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে- বিলেতযাত্রা, সময়স্বল্পতার জন্য আত্মীয়স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা করিতে পারে নাই, সকলের দোয়াপ্রার্থী।

বিমানবন্দর থেকে ট্রেনে চেপে উত্তরের শহরতলি ক্রয়ডনে চলে আসলাম। সহকর্মীর কল্যাণে সেখানের ছোট্ট একটা ছিমছাম বাসার বন্ধ জানলার কার্নিশ থেকে চাবি বের করে গোছানো দুই রুমের ঘরে ঢুকলাম দুজনে। তার গার্লফ্রেন্ডের বাসা, যিনি এই মুহূর্তে অফিসে। সেখান চা খাওয়া, লন্ডন সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর আলোচনা। অবশ্য বর্ণবাদী কথাও ছিলো, যেমন- আমি ইংলিশ, কিন্তু আই টেল ইউ, ইংলিশ লেডিস আর 'ডাল'। পরে ফোনে ওয়াইএমসিএর ইয়ুথ হোস্টেল ঠিক করা হলো – ৩৪, কার্টার লেন। সেন্ট পলস গির্জার খুব কাছে। গার্লফ্রেন্ডের ঝকঝকে অডিতে করে পৌছে দিয়ে গেলো সহকর্মী (ব্রিটিশ প্রেমিকদের প্রতি এই প্রথম ঈর্ষা অনুভব করলাম!)। যাওয়ার আগে এটিএম থেকে কড়কড়ে ৪০০ পাউন্ড দিয়ে গেলো – দেশে টাকায় শোধ করা হবে। প্রথম মানি- লন্ডারিং কেস। ইয়ুথ হোস্টেলে চেক- ইন করার সময় ছোটোখাট একটা শক খেলাম– ২৮ পাউন্ড প্রতি রাতের জন্য, তাও আবার চারজনের সাথে রুম শেয়ার করতে হবে। যেহেতু ওয়াইএমসিএর মেম্বার না, তাই ২ পাউন্ড দিয়ে মেম্বারশিপ নিতে হবে। রাইট। জানতে চাইলাম ছেলে- মেয়েরা একসাথে থাকা যায় কি না। স্যরি, গার্লফ্রেন্ড থাকলে তাকে আলাদা রুমে থাকতে হবে। ওকে।

তবে, জুনের রৌদ্র- ঝলমল ঝকঝকে দুপুরে সেন্ট পলস গির্জার পিছনের বিশাল লন, গাছপালা, রাস্তার ধারের কফিশপ আমাকে মুগ্ধ করলো। মেজাজ ফুরফুরে হয়ে গেলো।

দুজনকে আমার বিলেতসফরের ব্যাপারটা জানাতেই হয়েছে (জিনিস পৌঁছে দিতে হবে)- তাদের একজন ব্রিটেনে বড়ো হয়ে উঠা স্বল্পপরিচিতা সর্ট- অভ- কাজিন এবং দ্বিতীয় জন বছর দুই হয়েছে ব্রিটেনে ছাত্র হয়ে এসেছে। দুজনেই বিকেলে এলো দেখা করতে, জিনিস নিতে এবং 'টিপস' দিতে। 'ঘোরাঘুরির জন্য ডে- টিকিট কিনে নিবে (অফিস টাইমের পর পাওয়া যায়)'। 'টিউবের ম্যাপ পকেটে রাখবে এবং টিউবে চলাচল করলে হারানোর সুযোগ নেই'। 'এই ম্যাপ- তথ্যের বই A-Z টা বাইবেল'। 'গভীর রাতে ট্যাক্সিতে ওঠার দরকার নেই, বাসই সেফ'। এক সময় আমিও যোগ করলাম- দুই দিকে চেয়ে রাস্তা পার হবো, হোস্টেল থেকে বের হওয়ার সময় 'মোপিং- রুম' দেখলে...।

তবে দুবছরি ছাত্রের 'কস্ট সেভিং' টিপস ভাল লাগলো। মিনারেল ওয়াটার খাই শুনেই হায় হায় করে উঠলো। রান্নাঘরের 'ট্যাপ'- এর পাশে দেখবে প্লাস্টিকের গ্লাস আছে, ট্যাপ খুলে নিশ্চিন্ত মনে পানি খাও। ট্যুরিস্টদের সিস্টেম হলো সকালে ফ্রি ব্রেকফাস্ট গলা পর্যন্ত খেতে হবে, পরবর্তীতে খিদে লাগলে টিউব স্টেশনের দোকানগুলিতে এনার্জি ড্রিংক নামে বিভিন্ন ফ্লেভারের সুস্বাদু ঘন তরল পাওয়া যায়, একবার খেলে আর সহজে খিদে লাগবে না ...'।

পরদিন ভাবলাম ঝকঝকে মার্সিডিজ বাসে একটু ট্রাই করা যাক। শহর দেখা হবে। দুপুরে সেন্ট্রাল লন্ডনের জনহীন এক বাসস্টপে দাঁড়াতেই বাস এলো। পিছনের দরজা দিয়ে একমাত্র মেয়ে নেমে আসতেই বাসে উঠলাম। বাসে একা আমি। নির্জন বাসে বয়স্ক ড্রাইভার দেখি বদ্ধ কুঠুরি থেকে হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে ডাকে। ঘটনা কী? যেতেই মৃদু হেসে বললো– ট্যুরিস্ট?– 'রাইট', উচ্চারণটা হিউ গ্র্যান্টের মতো। শিখলাম– সামনের দরজা দিয়ে বাসে উঠতে হয়, পেছনের দরজা দিয়ে নামতে হয়।

প্রথম রাতে নগর পরিভ্রমণ শেষে জুনের রৌদ্রোজ্জ্বল রাত সাড়ে আটটায় ডেরায় ফিরে এসে সেন্ট পলসের আশেপাশে কোনো খাওয়ার দোকান খোলা না পেয়ে হোস্টেলের ভেন্ডিং মেশিল থেকে চিপস, চকোলেট এবং 'ট্যাপের পানি'তেই রাত কাটাতে হলো। আজ আর সেই ভুল করলাম না। খেয়েদেয়ে নটার দিকে হোস্টেলে ফিরে দেখি সর্ট- অভ- কাজিনের মেসেজ, ফোন করতে হবে। করলাম ফোন। জানতে চাইলো আজ শুক্রবার রাতের প্ল্যান কী? বললাম– আপাতত ঘুমানো। মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলো, লন্ডন দেখতে এসে শুক্রবার সন্ধ্যারাতে ঘুমাবার আয়োজন করলে চলে! তারপর আকর্ষণীয় রাতের লন্ডনের কথা শুনতেই রাজি হলাম বাইরে যেতে। কথা হল লেস্টার স্কোয়্যারে কাজিনের দেখা করবো রাত দশটায়। লেডিস টয়লেটের কাছের গেটে।

কভেন্ট গার্ডেন, লেস্টার স্কোয়্যার থেকে পিক্যাডেলি পর্যন্ত বিভিন্ন ক্লাব, ডিসকো থেক, সালসা, গাঁজার আসর থেকে শুরু করে সোহোর চিড়িয়াদের দেখা যখন শেষ হলো, তখন রাতে সাড়ে তিনটা। দর্শনীয় একটা রাত। দেখলাম, কী সহজে অপরিচিত ছেলেরা সর্ট-অভ-কাজিনকে নাচের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, এবং ততোধিক সপ্রতিভ কাজিন তাদের প্রত্যাখ্যান করছে। একটায় টিউব-রেলওয়ে বন্ধ হয়ে যায়, নিজে ঠিকমতো সেন্ট পলসে যেতে পারব কি না সেই ব্যাপারে সন্ধিহান, তারপরও বললাম, 'একা একা কী করে যাবে, চলো তোমাকে টুটিংএ পৌঁছে দেই।' গভীর রাতে লন্ডন শহরের পিক্যাডেলি সার্কাস নামক স্থানে দাঁড়িয়ে মধ্যযুগীয় সংকীর্ণ পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ধারণ করার জন্য এই আমি বাংলা-ইংলিশ মিলিয়ে বিশাল ঝাড়ি খেলাম যুক্তরাজ্যে বড়ো হয়ে উঠা এক তরুণীর কাছে। শুক্রবারের গভীর রাতের লন্ডনের রাস্তার যুবতীর কোমর জড়িয়ে ধরা অর্ধ-মাতালরা এর সাক্ষী হয়ে রইলো। তারপর জানতে চাইল, 'নিজে ফিরে যেতে পারবে তো, টিউব কিন্তু বন্ধ'। 'রাইট'। শেষে উলটো ঘটনা ঘটতে দেখা গেলো।

যেদিন ব্রিকলেনে গেলাম, সেদিনটাও মজার ছিলো। হোয়াইট চ্যাপেলে গিয়ে ব্রিকলেনটা ঠিক খোঁজে পাচ্ছি না। আপাতদৃষ্টিতে বাঙালি মনে হওয়া বয়স্ক এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত এক ভদ্রলোককে ইংরেজিতেই জানতে চাইলাম ব্রিকলেনটা কোন দিকে। দেখালেন। চোখে চোখ, তারপর পরিষ্কার বংলায় বললেন, 'আফনে কিতা বাংলাদেশ তনে আইসইন্নি?' 'অয়, সিলট থাকি আইসি'। অভ্যর্থনায়, আন্তরিকতায় সিক্ত হয়ে জুনের এই ঝকঝকে সকালে লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলে দাঁড়িয়ে সিলেটি হিসাবে তখনকার মতো নিজেকে ভাগ্যবান মনে হলো। অ্যাঙ্গলিসাইজড কাচ্চি বিরিয়ানির বিশাল মধ্যাহ্নভোজ হলো সেদিন।

বারোটা দিন প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করার চেষ্টা করেছি। তবে মোহভঙ্গের পালাও ছিলো। আমি দেশে যেখানে কাজ করতাম, সেখানে যুক্তরাজ্য থেকে পড়াশোনা শেষ করে ৬ মাস/১ বছরের জন্য ব্রিটিশ ছেলেমেয়েরা কাজ করতে আসত। তো সেরকম এক মেয়ের মেসেজ পেলাম একদিন, আমার সহকর্মীর কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েছে। ফোন করলাম। কী সব বললো। জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, হঠাৎ করেই জীবন ধন্য হয়ে গেছে, 'হ্যাভেন' থেকে তার জীবনে 'অ্যাঞ্জেল' নেমে এসেছে। কী উচ্ছ্বাস। ঘটনা কী? এই মেয়ে অবশ্য কিছুটা ধর্মকর্মের লাইনে ছিলো।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম তার জীবনে একজন পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে (বয়ফ্রেন্ড নামটা কখনোই উচ্চারণ করেনি)। 'প্লিজ দেখা করি চলো, লেটস 'ক্যাচ আপ'। আর অ্যাঞ্জেলের সাথে পরিচিত হতেই হবে। এই লন্ডনে অনেক কিছুই দেখতে চাই, তবে লিস্টের সবচেয়ে শেষে বোধ হয় এই অ্যাঞ্জেল। বিকেল থেকে 'ক্যাচ আপ' শেষে রাতের খাবারে অ্যাঞ্জেলের সাথে দেখা হলো। প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদির ব্যাপারে ভালো লাগার ব্যাপারটা খুবই সাবজেক্টিভ, এবং এ ব্যাপারে প্রেমিক-প্রেমিকাই কথাই শেষ কথা। তারপরও এটা স্বীকার করতেই হয় ঝকঝকে এই মেয়েটির অ্যাঞ্জেলকে দেখে খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। খুবই। ভদ্রলোকের ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে, লন্ডনের বাইরে থাকে, তিনি তার সদ্য প্রাপ্ত গার্লফ্রেন্ডের কল্যাণে তারই একরুমের ফ্ল্যাটে থাকেন, খান এবং বেশ কিছুদিন ধরে একটা কবিতার প্লট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। মাত্র কয়দিনের ব্যবধানের দ্বিতীয়বারের মতো ব্রিটিশ প্রেমিকদের প্রতি গভীর ঈর্ষা অনুভব করলাম।

দুবছরি ছাত্র আমাকে লন্ডন সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে গিয়ে একটা প্রচণ্ড বর্ণবাদী সংস্কার আমার মধ্যে গভীরভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। সেটা ছিলো – 'কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে সাবধান'। যেদিন সদ্য অ্যাঞ্জেলপ্রাপ্ত আমার প্রাক্তন সহকর্মীর সাথে দেখা হয়, সেদিন গোধূলিতে দুজনে কোনো একটা ব্রিজের উপর একটা বেঞ্চে নির্জনে বাসের অপেক্ষা করছিলাম। দুজনের মধ্যবর্তী হয়ে বসে ছিলো অদৃশ্য এক 'অ্যাঞ্জেল'। একজন কৃষ্ণাঙ্গ এসে খুচরো 'ভিক্ষা' চাইলো। সাথে সাথেই প্রাক্তন পকেটের সব খুচরো দিয়ে দিয়েছিলো। ভিক্ষা দাবিটা মোটেই ভিক্ষার ছিলো না, খুব রুক্ষ দাবি ছিলো, পকেটে ছিলো হাত আর এক ধরনের হুমকি। প্রাক্তন সহকর্মীর চোখের দিকে তাকাতে শুধু একটা কথাই বলেছিলো 'অন ড্রাগস'। আমি সেই সফরে অবশ্য এই বর্ণবাদী সংস্কার থেকে বের হতে পারিনি।

নিজের চোখে বিলেত দেখার থিম থাকলেও শেষ দেখলাম অনেকের চোখেই দেখা হয়ে গেছে। সর্ট- অভ- কাজিন, পুর্ব ইয়োরোপের ব্রাঙ্কা জিজিক, যুক্তরাষ্ট্রের পাইলট জিম, কিংবা ... লিস্ট বেশ বড়ো। অচেনা লোকের সাথে 'রুম- শেয়ার' করতে হবে এই প্রাথমিক মানসিক ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার পর মনে হয়েছে ইয়ুথ হোস্টেল একটা ভালো ব্যবস্থা। 'রুম- শেয়ারের' মধ্যেও যে কতটা প্রাইভেসি রাখা সম্ভব, এটার একটা আদর্শ উদাহরণ ইয়ুথ হোস্টেল। সবচেয়ে বড়ো কথা সকালের নাশতার সময়, কিংবা লবিতে বিভিন্ন দেশের লোকজনের সাথে পরিচিত হওয়ারও একটা আদর্শ জায়গা এই ইয়ুথ হোস্টেলগুলি। ৩৪ কার্টার লেন ছাড়াও আমি আরও দুটা ইয়ুথ হোস্টেলে ছিলাম – একটা উত্তরের হ্যাম্পস্টিডে (যেখানে গ্রুপে গেলে সুবিধা) এবং এবং আরেকটা পূর্বে, রোথারহ্যামে। রোথারহ্যামে প্রতিরাত্রে ছিলো মাত্র ১৫ পাউন্ড, সকালের বিশাল ইংলিশ ব্রেকফাস্টসহ।

প্রথমদিন হোস্টেলের ইন্টারনেটে বসেছিলাম মেইল চেক করতে, অশ্লীল রকমের ব্যয়বহুল। তারপর ভাবলাম থাক না বারোটা দিন একদম যোগাযোগহীন। তা-ই ছিলাম। শুধু দরকারে আমি ফোন করতাম। এইটুকুই বলতে পারি, চমৎকার বারো দিন কাঠিয়েছি– নিশ্চিন্ত, মুক্ত। নিশ্চিতভাবেই এমন একটা ভ্রমণ দ্বিতীয়বার আর সৃষ্টি করা সম্ভব না।

চাইনিজ!

ফারহানা সুফি

খাওয়াদাওয়া আর আমার সম্পর্ক নিবিড়। এটা সর্বজনবিদিত সত্য এবং দুষ্টলোকে এও বলে যে আমার সব আলোচনাই ঘুরে ফিরে কোনো এক সময়ে রসনাবিলাসে গিয়ে ঠেকে! তবে রাস্তার কেনা খাবার মানে যাকে বলে স্ট্রিট ফুড, তার প্রতি আকর্ষণ বেশি। ছোটোবেলায় ফাস্টফুডের চলন ছিলো না তেমন, বাইরে মানে রেস্টুরেন্টে খাওয়া বলতে যে জিনিসটা জনপ্রিয় ছিলো তার নাম ছিলো 'চাইনিজ'। এখন ভ্রমণ নিয়ে লিখবো বলে কিবোর্ড গুছিয়ে বসতেই মনে হলো ক্ষুধা লেগেছে, তারপর মনে পড়লো অনেকদিন চাইনিজ খাইনি। আর তার পরেই ধাঁই করে মনে পড়ে গেলো একবার ফুটপাথের ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে কিনে ফুটপাথেই বসে বুভুক্ষুর মতন খাওয়া ডিম- রুটি দিয়ে তৈরি কিছু একটা চীনা খাবারের কথা। যে ঘটনাটার কথা বলছি, সেখানে আমি বসে আছি তিয়েনানমেন স্কয়ারের কাছেই একটা বড়ো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বাইরের সিঁড়ির উপর ফুটপাথে, সময়টা ২০০৪ এর আগস্ট। সামনেই খোলা ঠেলাগাড়িতে যে জিনিসটা বানানো হচ্ছে সেটা আসলে আমাদের মোগলাই পরোটার মতন। বিশাল গরম তাওয়ায় তেল ছড়িয়ে তাতে আটা গোলা দেওয়া হচ্ছে পাতলা করে ছড়িয়ে, তার উপর চার- পাঁচটা ডিম একসাথে ভেঙে দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবার বড়ো গোল রুটিটা পিজ্জার মতন একবারে তুলে উলটে নিয়ে সেঁকে ভাঁজ করে ফেলা হচ্ছে পরোটার মতন, সবশেষে সার্ভ করা হচ্ছে পাতলা কাগজের উপরে তুলে। বানানো শেষ হতে না হতেই গরম গরম বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। পাশে তাকাতেই আমার ভাই বললো, "এটার নাম দিলাম 'কাগুজে চিনলাই'।" দেখি সে গরম মোগলাই- এর সাথে উঠে আসা কাগজও পাতলা রুটি মনে করে মুখে পুরে ফেলেছে!

এক হপ্তা ধরে আমরা সারাদিন বিশাল এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রের আনাচকানাচ ঘুরি, মাঝে মাঝে কোনো বড়ো বা ছোটো হলে ঢুকে কচকচানি লেকচার শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি। আসলে সম্মেলনে আমরা নিবন্ধন করলেও, মূল বিষয়টা বাবা- মায়ের কাজের সাথে সম্পৃক্ত। আমার ভাইয়ের কলেজ ছুটি ছিলো, আর আমি বেইজিং- এর নাম শুনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস- ল্যাব সব বাংক করে সাথে জুটেছি।

প্রথমদিন বিকালে পৌঁছে রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির হ্যাপা চুকিয়ে বাংলাদেশের সদস্যরা যখন হোটেলে রুমের দখল নিয়ে, ব্যাগ রেখে আবার সম্মেলনকেন্দ্রে ফিরেছি, তখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশেষ সন্ধ্যাকালীন নাশতার শেষ পর্যায়। খাবারদাবার সব প্রায় শেষ, অবশিষ্ট আছে কিছু আজব শ্রেণীর চালের পাঁপর। সম্মেলনসূচী অনুযায়ী সপ্তাহব্যাপী কর্মকাণ্ডের একদিন সন্ধ্যাতে অফিশিয়াল খানাদানার আয়োজন আছে। তবে পরের কথা পরে, ঐদিন আমরা শেষ খেয়েছি প্লেনে, তাও বেইজিং সময় সকাল ১০টার দিকে! আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে এশিয়ান গেইমস ভিলেজের হুই- ইউয়ান আবাসিক কমপ্লেক্সের একটা বিল্ডিঙে, ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্টে। সম্মেলনকেন্দ্র সেখান থেকে হাঁটার দূরত্বে, কিন্তু খাবারদাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই, এক চা ছাড়া।

প্রথম সন্ধ্যাতেই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হলো ধারেকাছে ভালো খাবারের জায়গা খুঁজে বের করে ফেলতে হবে। সম্মেলনকেন্দ্রের ভেতরে দুপুরের খাবারের কিছু আয়োজন থাকলেও খরচ বেশি, আর রাতেরও বন্দোবস্ত দরকার। সকালের জন্যে ফলমূল, রুটি নিজেরাই কিনে নেই। দ্বিতীয় দিনে দুপুরে এশিয়ান গেমস ভিলেজ থেকে বেরিয়ে ম্যাকডোনাল্ডস খুঁজে বের করা হলেও প্রতিবেলায় ফাস্টফুড খাওয়াটা পকেটের চেয়েও বড়ো কথা পেটে সইবে না। তাই আমরা আরেকটু জরিপ করে খুঁজে বের করলাম স্থানীয় এক রেস্টুরেন্ট। সেদিন সন্ধ্যায় হেঁটে গিয়ে হাজির হলাম প্রথমবারের মতন এক সত্যিকারের চীনা রেস্টুরেন্টে!

দোকানটা এমন কিছু বড়ো নয়, ঢুকে হাতের ডানে রাস্তার দিকের গ্লাসের সাথে কিছু টেবিল আছে দেওয়ালে আটকানো, দুদিকে গদিমোড়া বেঞ্চ। মাঝে ছড়ানো ছিটানো কিছু টেবিল, আর বাঁয়ে আছে কিছু বুথ, আমাদের দেশের হোটেলগুলোর মতোই। দেশের হোটেলের মতোই পুরো রেস্টুরেন্ট জুড়ে মানুষদের ব্যাপক হাউকাউ, আমাদের মতোই হইচই করে কথা বলছে, হাসছে, আড্ডা দিচ্ছে সবাই। দোকানের পেছনদিকে কাউন্টার, ড্রিংক্স ইত্যাদির জন্যে ফ্রিজ আর চিপস ইত্যাদির র‍্যাক। তখন বাজে প্রায় রাত সাড়ে আটটা, প্রাইভেট বুথগুলো থেকে শুরু করে প্রায় সব টেবিলই খদ্দেরদের দখলে। কোনোরকমে একটা গোল টেবিলের দখল নেওয়ার পরে শুরু হলো চীনা ভাষায় আমাদের দক্ষতার অন্যতম পরীক্ষা। আমি খুব ভালো 'হ্যালো' বলতে আর 'ধন্যবাদ' দিতে পারি ম্যান্ডারিনে। আর জানি কী করে বলতে হয় পানি, মা, বড়োবোন- এরকম প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় কিছু টুকিটাকি শব্দ। কাজেই দোভাষী দায়িত্বে আমি। আসার আগে তিনদিনে লোনলি প্ল্যানেটের 'চায়না' বেশ ভাজা ভাজা করে ফেললেও, আবিষ্কার করলাম জরুরি কিছু শব্দ শেখা হয় নাই, যেমন – মুরগি!

চীনারা নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতির ব্যাপারে বেশ সচেতন। তারা সেই প্রাচীনকাল থেকে চীনকে পশ্চিমাদের হাত থেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে এসেছে। পঞ্চাশ বছর আগেও বিদেশিদের জন্যে পর্যটনের অনুমতিতে ছিলো হাজারটা ফ্যাঁকড়া, এখনো যে ব্যাপারটা খুব সহজ তা নয়, তবে মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতা, এশিয়ান গেমস আয়োজন, এগুলোর মাধ্যমে ২০০৪-এর আগেই চীন পর্যটনকে গ্রহণ করে নিয়েছে লাভজনক শিল্প হিসেবে। তবে তারা প্রকৌশল বা চিকিৎসাশাস্ত্রের মতন উচ্চশিক্ষাতেও যেহেতু নিজেদের ভাষাই ব্যবহার করে আসছে যুগ যুগ ধরে, তাই অধিকাংশ মানুষই ইংরেজি জানে না, এবং দরকারও মনে করে না।

এই খাবারের দোকানেও ইংরেজি না জানার ব্যত্যয় ঘটলো না। প্রথমে এলো এক অল্পবয়সি মেয়ে। আমাদের এখানে যেমন হোটেলে বসলেই ছোটো ছোটো বয় বেয়ারারা প্রথমেই কাচের গ্লাসে পানি ঢেলে দিয়ে যায়, সেরকমসে প্রথমেই প্লাস্টিকের রঙিন গ্লাসে ঢেলে দিয়ে গেলো হালকা লিকারের ধোঁয়া ওঠা চা, আর এগিয়ে দিলো মেনু। সম্পূর্ণ রঙিন ছবি সম্বলিত এবং সম্পূর্ণ চৈনিক মেনু ঘেঁটে আমরা ধাঁধাঁর জবাব বের করার মতো খুঁজে খুঁজে বের করলাম কিছু যেটা মুরগি হলেও হতে পারে! আস্ত মাছের ছবিওয়ালা একটা ডিশও দেখা যাচ্ছিলো কিন্তু এটা দেখাতেই মেয়েটা মাথা নেড়ে বোঝালো- আজকে এটা হবে না, শেষ। তবে মুরগিরটা, মুরগি কি না কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। শেষে ডেকে নিয়ে এলো এক সুদর্শন বুদ্ধিমান ওয়েটারকে।

এই ছেলেটা বেশ মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো আমরা কী খেতে চাইছি। আমি ওদিকে ব্যাগপ্যাক থেকে নোট বই, পেন বের করে অঙ্কনচর্চায় মনোনিবেশ করেছি। প্রথমে আঁকলাম একটা বাটি, তাতে ধোঁয়া ওঠা ভাত, আমি যেন ভারি মজার কিছু করেছি এমন একটা হাসি দিলো সে। আমি সবাইকে দেখিয়ে বললাম, এই জিনিস সবার জন্যে। সে খুব মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করলো। এবার আঁকলাম একটা মুরগি, ছবির ডিশ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম এটাই সেই জিনিস কি না, সে মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ বললেও মনে হলো যেন এটা ঠিক দিতে চাচ্ছে না। তবুও জোর করলাম দিতে। তারপর বের করলাম একটা আধাসেদ্ধ সবজির ছবি। সবজি অর্ডার দিয়ে, একটা স্যুপের আইটেম বের করে ছবি দেখিয়ে মুরগির কোনটা জানতে চাইলাম, সে একটা দেখিয়ে দিয়ে নোট করে নিলো। নিশ্চিত হবার জন্যে আমি আঁকলাম একটা কার্টুন পিগহেড, তারপর সেটা একটা বড়ো ক্রস দিতে কেটে দিলাম। আর আঁকলাম একটা গেলাসে রঙিন পানীয় আর পাশে বোতল, তারপর সেটাও কেটে দিলাম, পাশে আঁকলাম আরেকটা গ্লাস, তাতে ডট ডট দিয়ে পানি দিয়ে টিক মার্ক আর বললাম, 'শ্রঅয়ে'। সে আবার একটা ভুবনভোলানো বিশাল হাসি দিলো, যেন- বুঝেছি হে, তোমরা খাবে না এসব। তবে পানির ব্যাপারে গ্লাসের গরম লিকার চা দেখালো, মানে ঐটাই। তখন উঠে গিয়ে র‍্যাক থেকে আলাদাভাবে মিনারেল ওয়াটারের বোতল কোক, এগুলো কিনলাম।

পরে খাবার এলে আবিষ্কার হলো, মুরগির সেই স্যুপে মুরগির আস্ত ঠ্যাং নখটখসহ ভাসছে। নাড়িভুঁড়ি, চামড়া, গিলা-কলিজা সবই আছে, কোনো কিছুরই অপচয় করা হয় নাই! মুরগির রেসিপি প্রথমে না দিতে চাওয়ার

কারণটাও বোঝা গেলো। পুরো ডিশ জুড়ে শুধু লাল লাল শুকনো মরিচ, মাঝে ছোটো ছোটো কড়া করে ভাজা মুরগির টুকরো, তবে মুরগি আসলে নেহায়তই কম, মরিচই বেশি। আমাদের ভাতের বাটিতে সেই স্যুপকে ডালের মতন নিয়ে ঐ মুরগির টুকরো দিয়ে চপস্টিক দিয়ে নাকানিচুবানি খেয়ে কোনোমতে খাওয়া হলো। দূর থেকে সেই ছেলে আর মেয়ে ওয়েটার আমাদেরকে দেখে আর হাসে, কাছে এসে পরিবেশন করার সময়েও মুচকি মুচকি হাসে। পরে জেনেছিলাম ওয়েটারের নাম চেন।

আমাদের গায়ের রঙ আর চেহারা সবাইকেই খুব আকর্ষণ করছিলো মনে হয়েছে যেখানে গিয়েছি। আমাদের দেশের যেমন সাধারণ জনগণ ইউরোপীয় বা আমেরিকানদেরকে দেখে অবাক হয়, আমরাও চীনা সেরকম প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। গ্রীষ্মের বেইজিং- এ ট্যুরিস্ট বলতে আমি চীনাদেরকেই বেশি দেখেছি, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাজধানী বেড়াতে এসেছে। আর তার মাঝে অনেক অপরিচিত মানুষ তিয়েনানমেন স্কয়ারে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, বিশেষ করে শাড়ি জিনিসটা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখেছে। আমরা কোথা থেকে এসেছি তা জানতে চেয়েছে আকারে ইঙ্গিতে। বাংলাদেশ–এর বদলে 'মঙ্গালা' বলায় কিন্তু ঠিকই বুঝেছে আমরা কোন জায়গা থেকে এসেছি এবং বেশ অবাক হয়ে আমাদের গায়ের বর্ণ, পোশাক- আশাক আরো খুঁটিয়ে দেখেছে নিরীহ কৌতূহলে।

সম্মেলনকেন্দ্রের তথ্যকেন্দ্রে আমার সমবয়সি কিছু ছেলেমেয়ের সাথে বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছেলেমেয়েগুলো গ্রীষ্মাবকাশে ভলান্টিয়ার আর দোভাষীর কাজ করে। মা- লি আমাকে বলেছিলো 'নিষিদ্ধ প্রাসাদ'- এর উত্তর গেট দিয়ে প্রবেশ করলে সুবিধা হবে। কিন্তু যেদিন সকালে আমরা 'ফরবিডেন প্যালেস' দেখতে যাই, সকালের সেসময়ে প্যালেসের উত্তর গেট ছিলো বন্ধ। আমরা ঘুরে আবার দক্ষিণ- পূর্বের গেটের দিকে প্রাসাদের বাইরের পরিখার ধার দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় ঝিরিঝিরি গাছের ছায়ায় হেঁটে যাচ্ছি, এমন সময় দুই ফেরিওয়ালা আমাদেরকে দেখে দূর থেকে "আলহামদুলিল্লাহ!", "হালাল!" বলে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগলো। এমন অভূতপূর্ব অভ্যর্থনায় ঘটনা কী দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম এক ধরনের বাদামের হালুয়া বিক্রি করছে ঠেলাগাড়িতে করে। চেহারায় তাদের মংগোলীয় ছাপ থাকলেও মনে হলো তারা আসলে আফগান বংশোদ্ভূত। আমাদেরকে দেখে তাদের মনে হয়েছে আমরা যেহেতু দক্ষিণ এশীয়, এরকম ভাবে ডাকাডাকি করলে বিক্রিবাটার কিছু সুযোগ আছে। তাদেরকে খুশি করতেই বিশেষ করে খানিকটা বাদামের হালুয়া কেনা হলো। জিনিসটা লেয়ারে লেয়ারে বিভিন্ন ধরনের বাদামের টুকরো আর ক্যারামেল দিয়ে তৈরি, পুরোটা একবারে বড়ো একটা চাঁইয়ের মতন ঠেলাগাড়ির উপরে রাখা, সেখান থেকে চাকু দিয়ে আমাদেরকে খানিকটা কেটে দিলো।

প্রাসাদের নাম ‘নিষিদ্ধ’, কারণ সাধারণের জন্যে প্রাসাদ ছিলো নিষিদ্ধ। ভেতরে মূল অংশে আছে বড়ো বড়ো চত্বর, একটা পেরিয়ে একটা, ধীরে ধীরে তা আবার উঁচু হয়ে গেছে। বিশেষ দিনগুলোতে সম্রাট এসে একদম কেন্দ্রীয় চত্বরের প্রধান হলের সিংহাসনে বসতেন। হলের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ পর্যটকদের, বাইরে থেকেই মিং সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারুকাজ দেখলাম পুরো দেওয়াল মেঝে জুড়ে। চত্বরের মাঝে কৃত্রিম লেকের উপরে শ্বেতপাথরের কারুকাজ করা ব্রিজ, মিং রাজাদের চিহ্ন বিশাল কচ্ছপ আর অন্যান্য প্রাণী, ড্রাগন আর সিংহের প্রস্তরমূর্তি।

মিং সাম্রাজ্য আর সম্রাটের দীর্ঘজীবিতার প্রতীক কাছিম

প্যালেস গার্ডেন

শেষপ্রান্তে সম্রাটের ব্যক্তিগত বাগানে এসে হাজার বছরের প্রাচীন সব গাছ, আর সুন্দর রঙবেরঙের টুকরো পাথর বসিয়ে যত্ন করে নকশাকাটা হাঁটবার পথ দেখে আমরা হতভম্ব। কোন বেদিতে বসে কততম মিং রাজা কবিতা লিখতেন, কোথায় বসে গান শুনতেন সব দেখছিলাম অবাক হয়ে। কিন্তু শুধু গাছ দেখলেই কি আর পেট ভরে? দবল হাঁটাহাঁটিতে আমাদের ক্ষুধা লেগে গেছে। বাগান থেকে বেরুতেই দেখি প্রাসাদের ভেতরেই শেষপ্রান্তের প্রাচীর ঘেঁষে একটামাত্র দোকান, কিন্তু সেখানে শুধু চাইনিজ ইন্সট্যান্ট নুডলসের বক্স বিক্রি হচ্ছে, ব্যস! সেটাই খেলাম দোকানের সামনের ধাপে বসে। এদিকে আবার উত্তর মাথা থেকে হেঁটে দক্ষিণ গেটে ফিরতে হলো। ঐদিকেই সেই বিখ্যাত তিয়েনানমেন স্কয়ার, তাতে পিপলজ হিরোস মনুমেন্ট আর চেয়ারম্যান মাও- এর মুউসোলিয়াম।

এক বৃষ্টিভেজা দিনে বেইজিং থেকে ঘন্টাখানেকের দূরত্বে গ্রেট ওয়ালের অংশবিশেষ দেখতে গিয়েছিলাম আমরা সম্মেলনের পক্ষ থেকে আয়োজিত

ট্যুরে। চীনার প্রাচীরের এখন আর পুরোটা অবশিষ্ট নেই, পুরোটা তৈরিও হয়নি একবারে। তবে সম্পূর্ণ প্রাচীর আসলে উত্তরাঞ্চলের পূর্ব সমুদ্রতীর থেকে পশ্চিমে প্রায় ৫০০০ মাইল দীর্ঘ। পূর্বের প্রাচীর বেশিরভাগটাই পর্বতমালার উপরে তৈরি, পাহাড়ের মতোই ঢেউ খেলানো, চড়াই- উতরাইওয়ালা। তাই বলা হয়- প্রাচীরে যে উঠেছে, সে 'বিজয়ী'। পর্বতের গায়ে বলেই প্রাচীর আসলে প্রায় পুরোটাই একটা চওড়া সিঁড়ির মতন। বহু বছরের অযত্নে ভেঙে যাওয়া ধাপগুলি, এখন ট্যুরিস্ট অংশগুলোতে মেরামত করা হয়েছে, পর্যটকদের অন্যান্য সুবিধার সাথে এখন লাগানো হয়েছে রেলিং। তার পরেও রেলিং- এর ধার ঘেঁষে পাথর ক্ষয়ে গর্ত হয়ে গেছে পর্যটন- মৌসুমে আসা লাখো পর্যটকদের পায়ের ঘর্ষণে। ধাপগুলোও অনিয়মিত উচ্চতার, পাহাড়ের গায়ে বলেই। হাজার হাজার মানুষ উঠছে- নামছে আমাদের সাথেই, আমাদের মতো তরুণদের পাশ কাটিয়ে বৃদ্ধ দাদার হাত ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছে পিচ্চি পিচ্চি এক বা বছর আড়াইয়ের শিশু! সত্যি চীনাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তি প্রশংসনীয়।

পর্বতের গায়ে চীনের প্রাচীর

এইদিন দুপুরে আমাদের খাবারের আয়োজন যেখানে ছিলো সেখানে গিয়ে আমরা যে টেবিলে বসেছি তাতে আরো ছিলেন ভারতীয় আর ইন্দোনেশীয় কয়েকজন। কিন্তু সব টেবিলে নানান রকম খাবার পরিবেশন করলেও আমাদেরকে খালি সবজি বা সেদ্ধ সব রসকষহীন খাবার দেওয়ায় সন্দেহ হলো, কয়েকটা টেবিলে চীনা হরফে লেখা ছিলো 'ভেজিটেরিয়ান'! শেষে দ্রুত সাইনটা খুলে আস্তে করে চালান করে দিলাম টেবিলের নিচে! ব্যস, এবার নন- ভেজ, আধা সেদ্ধ, সয়াসস ডুবোন খাবার আসতে শুরু করলো টেবিলে।

কনফারেন্সের ডিনারের জন্যে আমরা বেছেছিলাম ঐতিহ্যবাহী পিকিং ডাক- এর জন্যে জনপ্রিয় এক রেস্টুরেন্ট। আমরা যেখানে বসেছি তার পেছনেই খোলা রান্নাঘর আর শেফদের রন্ধনপ্রণালি উন্মুক্ত সকলের জন্যে। মূল পদের আগে চললো অন্যান্য খাবার, ধাপে ধাপে একটা শেষ হলে অন্যটা আসে। প্রথমে এলো কাঠের তৈরি র‍্যাকের উপরে ভেজা কাপড় শুকাতে দেবার মতো করে রাখা পাতলা পাতলা মাংসের স্লাইস, সেটা সয়া সসে ডুবিয়ে খেতে হয়। এটা গেলে এল শ্রিম্প ককটেইল, সেটা গেলে এলো আরেকটা জিনিস। সবশেষে এলো পিকিং ডাক। পুরো হাঁসকে বিশেষ উপায়ে রোস্ট করে তৈরি করা হয়, টেবিলে আমাদেরকে আস্ত হাঁস সার্ভ না করে স্লাইস করেই এনে দিয়েছিলো। আর তাতে আসলে মশলার তেমন কোনো বালাই নেই। খেতে হয় হাতে গড়া চালের আটার ছোট্ট ছোট্ট রুটিতে মুড়িয়ে, বিশেষ একটা সসে ভিজিয়ে। আমাদের টেবিলে উপস্থিত চীনা গবেষকেরা আগ্রহ নিয়ে দেখিয়ে দিলেন কোনটা ঠিক পদ্ধতি খাবার।

'বেইজিং নাইট শো'- তে সুবিশাল চীনার বিভিন্ন প্রদেশের ঐতিহ্য আর লোকাচার নাচের মাধ্যমে তুলে ধরেন শিল্পীরা, সাথে দর্শকদের জন্যে পরিবেশিত হয় ঐতিহ্যবাহী চীনা খাবার। দেখছিলাম, একে একে বিভিন্ন পদ আসছে, এমনিতেও আধা সেদ্ধ, মাংস, ইত্যাদি অদ্ভুত খাবারের ঠেলায় রুচি আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই আর অমন চমৎকার শো দেখেই বেশি অভিভূত আমরা। হঠাৎ দেখি পরবর্তী আইটেম হিসেবে এসেছে কর্ন স্যুপ! মজার ব্যাপার হলো পরে যদিও ওনেকে বলেছে এই কর্ন স্যুপও সবসময়ে আমাদের 'বাংলাদেশী

চাইনিজ'- এর মতো হয় না, আমি কিন্তু দশদিনের বেইজিং রসনাবিলাসে এই একটা জিনিসেই আমার সেই সুপরিচিত 'চাইনিজ'- এর স্বাদ পেয়েছি! এর পরেই আরেকটা জিনিস এসেছিলো সেটা আওরা যাকে বলি ফ্রাইড রাইস। এটার স্বাদও আমাদেরটার কাছাকাছি ছিলো। তবে চীনারা কিন্তু ফ্রাইড রাইস করে আগের দিনের বেঁচে যাওয়া বাসি ভাত থাকলে, ঠিক যেমন আমরা করি ভাত- ভাজা বা ভাত- তেলানি, খালি আমরা যেমন তাতে হলুদ মরিচ পেঁয়াজ দেই, ওরা তা না দিয়ে ডিম ভেজে দিয়ে দেয় টুকরো করে। তবে এটা পুরোটা খাওয়ার আর সুযোগ হয় নাই, কারণ শো ততক্ষণে শেষ আর দর্শকরাও ছুটেছেন স্টেজের দিকে, শিল্পীদের সাথে মঞ্চেই ছবি তোলা যাবে বলে।

বেইজিং নাইট শো

আমাদের সেই চীনা হোটেলে অবশ্য প্রথম রাতের পরে আমরা বুদ্ধিমানের মতো তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হতাম। আমাদেরকে দেখলেই অন্যদের দায়িত্ব থেকে চেনকে অব্যাহতি দিয়ে দিত মালিক, আর সে উদ্ভাসিত মুখে ছুটে আসতো। এর পরেও যে, সব খাবারই দারুণ মুখোরোচক ছিলো তা নয়! একদিন মুরগির তরকারিমতো একটা কিছুর অর্ডার দেওয়া হলো, তা সেটা দেখা গেলো তেল চুপচুপে একটা পুরো মুরগি, মানে ঐ সেই প্রথম দিনের স্যুপের মতোই তাতে একটা চিকেনের সব বডি- পার্টই ব্যবহার করা হয়েছে! মাছের স্বাদ তুলনামূলকভাবে ভালো, বড়ো একরকম তেলাপিয়া ধরনের মিঠা পানির মাছ মনে হয়, সেটা আস্ত রেখেই তেল- মশলায় ভাজার মতো করে রান্না, ভেতরটা আসলে সেদ্ধসেদ্ধই, তবে উপরে বেশ নোনতা আছে, কাজেই চালিয়ে নেওয়া যায়। সমস্যা হতো চপস্টিকে আমরা কেউই সিদ্ধহস্ত না হওয়ায়। মা অবশ্য বুদ্ধি করে নিজের সাথে আনা কিছু প্লাস্টিকের কাঁটাচামচ বের করে দিতেন আমাদেরকে। ঠিক দেশের রেস্টুরেন্টে গ্লাসের পানি ফুরিয়ে গেলেই যেমন দ্রুত আবার সব গ্লাস ভরে দিয়ে যায় কেউ, তেমনি আমাদের প্লাস্টিকের গেলাসের লিকার চা ফুরিয়ে গেলেই আবার সেই মেয়েটা এসে মুহূর্তের মাঝেই সবার গেলাস ভরে দিয়ে যেত আরো চা।

আসবার আগের সন্ধ্যায় আমরা একটু তাড়াতাড়ি গিয়েছি আমাদের সেই রেস্টুরেন্টে। পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে, তাই তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে ঘুমাবো সবাই। গিয়ে দেখি, মালিকের ৯- ১০ বছরের বাচ্চা মেয়েটা ইশকুল থেকে চলে এসেছে সোজা দোকানে। মা- এর কাছে ঘ্যান ঘ্যান করছে, আর খানিক পর পর আমাদের আশপাশ দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। বেশ বুঝছি ওর আগ্রহ আমাদের সাথে একটু আলাপ করে, তা চেন আর সেই ওয়েইট্রেস মেয়েটা আমাদের কাছে নিয়ে এলো তাকে, দেখলাম সামান্য ভাঙা ভাঙা ইংলিশ সে জানে, নতুন প্রজন্মের অনেকেই হয়তো ইংলিশ মিডিয়াম ইশকুলে পড়ে আমাদের এখানকার মতোই, কে জানে।

এই দশদিনে প্রথম এবং শেষবারের মতো চীনা হোটেলে খাচ্ছি আমরা। বিদেশ- বিভুঁইয়ে আমাদের মতো ভেতো বাঙালিকে ভাত খাইয়েছে, যত্ন করে গেলাস ভরে চা দিয়েছে, আপ্যায়নের ত্রুটি করে নাই হোটেল কর্তৃপক্ষ, প্রতিদিন আমাদের জন্যে বরাদ্দ গোল টেবিলটাও আগলে রেখেছে। একবার মনে হলো বুঝিয়ে বলি, কাল থেকে আর আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না

তোমাদেরকে। কিন্তু সময় শেষ ততক্ষণে, উঠে পড়েছে দলের অন্যেরা। হালকা একটা ভালো লাগা আর মন খারাপের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে উঠে পড়লাম অন্যদের সাথে। থাক, কিছু সময় বিদায় নেবার দরকার নেই হয়তো, আবার আসা যাবে সেখানে ‘চাইনিজ’ খেতে কোনো একদিন, কে জানে, জীবনের কোনো এক ক্ষণে।

প্রিয় দুর্গতিগাথা

রিসালাত বারী

যাপিত জীবন, উদযাপিত আনন্দ আর আস্বাদিত স্বাদ নিয়ে আমার কাতরতা প্রবল। অনিশ্চয়তা, দুর্ভোগ, বিপত্তি আর ঝুঁকির সংমিশ্রণে প্রথম সেন্টমার্টিন দর্শনও আমাকে প্রায়শ কাতর করে। বিপত্তিটা শুরু হলো হল থেকে দুই পা ফেলামাত্র। ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত ৮টা। আমাদের সমস্ত ভ্রমণ পরিকল্পনা মোটামুটি আধাঘন্টা থেকে দুঘন্টার নোটিশে কার্যকর হয়। সেই তুলনায় আজকের পরিকল্পনাটা প্রাগৈতিহাসিক, প্রায় পাঁচ দিন আগের। বাড়তে বাড়তে সদস্যসংখ্যা দশজনে ঠেকলেও মূল পরিকল্পনাকারী প্রিন্স অনুপস্থিত। তাতে অবশ্যই আমরা খুশি। কারণ প্রিন্স কোন ট্যুরে থাকলে তাতে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।

রাস্তায় নেমেই খেয়াল হলো কাল ২১শে ফেব্রুয়ারি, তাই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা যানবাহনমুক্ত। মেদবহুল স্থূল দেহখানা নিয়ে পদব্রজে কার্জন হল পার হয়ে হাইকোর্ট দর্শনের পর একটা রিকশার দেখা মিললো। তাতে চেপে বসে খোঁজ নেওয়া শুরু করলাম কে কতদূর। আমার সাথে আছে হেলাল, আবু নাঈম, সুমন ছুঃ আর উত্তরাধুনিক কবি শাওন। পিয়াস কাওসার, আবীর জিয়া, হোৎকা তমাল, রসু খাঁ(রুশো) , কয়েদি(জনি) বাসা থেকে আসবে। সবাই রওনা দিলেও হোৎকা যথারীতি লেট তার টিউশনির জন্য। ছাত্রী পড়িয়ে মাত্র রওনা দিচ্ছে সে। মুখ দিয়ে খিস্তি বেরিয়ে আসে।

টিটিপাড়া গিয়ে আক্কেলগুড়ুম কথাটার অর্থ পরিষ্কার হলো। অতীতে দোকানপাট বা দালান উঠে যেতে দেখেছি কিন্তু একটা এলাকা রাতারাতি নাই হয়ে যেতে দেখলাম এই প্রথম। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সব দোকান, বাস কাউন্টার ভেঙে দিয়ে সেটাকে একটা ভুতুড়ে জায়গায় পরিণত করেছে। কমলাপুর এলাকায় গিয়ে শুনি টিটিপাড়া- উচ্ছেদের প্রতিবাদে তাদের অধিকাংশ বাস ধর্মঘটে। চট্টগ্রামের একটাই বাস আছে কিন্তু সিট নাই। আমাদের মুখপাত্র এবং কূটনৈতিক পিয়াস কাওসার আর ফান্ড কমিটির কোষাধ্যক্ষ হেলাল গেলো ব্যবস্থা করতে। কিছুক্ষণ পর হেলাল জানালো সম্ভাবনা আছে, অপেক্ষা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের দশজন এবং আরো বেশ কিছু অতিরিক্ত লোকের চাপে কর্তৃপক্ষ একটা অতিরিক্ত বাস ছাড়তে রাজি হলো, তবে তা ১২টার পর। আমাদের আপত্তি নাই, যেতে পারলেই হলো।

একটা ফান্ড করা হলো সবাই পাঁচ'শ টাকা করে দিয়ে। হেলাল ম্যানেজার। ভ্রমণের খরচ ফান্ড থেকে হবে। সময় কাটানোর জন্য রাস্তা পার হয়ে রেলস্টেশনে ঢুকে গেলাম। একটার পর একটা ট্রেন চলে যায়, একসময় প্ল্যাটফরম ফাঁকা হয়ে গেলো। ফাঁকা প্ল্যাটফরম পৃথিবীর বিষণ্ণতম জায়গার একটা। চিপসের প্যাকেট, বাদামের খোসা, ছেঁড়া খবরের কাগজ সবকিছুর মাঝেই অতীতের হাহাকার।

বাস ছাড়লো রাত সাড়ে বারোটায়। প্রচণ্ড ক্লান্ত থাকায় অন্যান্য বাসযাত্রীদের তেমন বিরক্ত না করেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ঘুমাতে পারছি না ওস্তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে। ওস্তাদের এক হাতে স্টিয়ারিং অন্য হাতে পানের বোঁটায় চুন। পান খায়, চুন খায়, পাশে বসা হেলপারের সাথে গল্পে মশগুল কিন্তু স্পিডোমিটারের কাঁটা ১১০- এর নিচে নামে না। একসময় ক্লান্তি আর আতঙ্কেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভেঙে দেখি অলংকার! চট্টগ্রামে ঢোকার মুখে একটা জায়গা। বাস গন্তব্যে পৌঁছার পর হোৎকা লাফ দিয়ে উঠে জানালো যে তার টাকাপয়সা সব ব্যাগে এবং ব্যাগটা নাই। কয়েকটা খিস্তি ছুটে গেলো আশপাশ থেকে। কাওসার গিয়ে ধরলো হেলপারকে। দশটা দামড়া পোলাপান দেখে সে বেচারার কাঁদোকাঁদো অবস্থা। বহু হম্বিতম্বি করে কাজের কাজ একটাই হলো যে আমরা টেকনাফের বাস মিস করলাম। আবারো সবার রাগ হোৎকার উপর। পরবর্তী বাসের জন্য আরো দুই ঘন্টা অপেক্ষা। তিন টাকার পরোটা আর পাঁচ

টাকার ডাল খাইয়ে ম্যানেজার টাকা বাঁচালো। কী আর করা, সেই পরোটার ঢেকুর তুলে বসে থাকলাম বাসের অপেক্ষায়। আমি আর আবীর কিছুক্ষণ পরপর হোৎকাকে মনে করিয়ে দেই পরের তিন দিন ঐ এক বস্ত্রেই কাটাবি তুই। ভয়টা আকৃতিগত সামঞ্জস্যের কারণে আমাদের দুইজনেরই সবথেকে বেশি! আর কারো কাপড় তমালের গায়ে হবে না। সে ব্যাটা খালি ফ্যাকফ্যাক করে হাসে আর বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে। ম্যানেজার হুমকি দিলো হুকা- তামাকের টাকা বন্ধ। এইবার তার মুখটা একটু করুণ দেখায়।

টেকনাফের বাসে উঠে ফের বিপত্তি। আমি বা আবীর কারোই হাঁটু রাখার জায়গা হয় না। হাঁটু ভাঁজ করে দীর্ঘ পথ কাটাতে হলো। পৌঁছালাম বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে। ততক্ষণে কেয়ারি সিন্দবাদ, কুতুবদিয়া ইত্যাদি কোনোটাই আর অবশিষ্ট নাই। আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি এ যাত্রায় সহজ-স্বাভাবিকভাবে আর কিছুই জুটবে না। কয়েদি, আবীর আর কাওসার তখন পপি গাছের শুকনো ডাল, লতাপাতা দিয়ে মঙ্গলপানে যাত্রার টিকেট কাটতে ব্যস্ত হয়ে পরেছে। রুশো আর হেলাল গেলো ট্রলারের খোঁজে। আমরা এদিক ওদিক একটু হেঁটে ট্রলারের ঘাটে ঢুকে দেখি সেখানে আরেক তামাশা। ট্রলার আছে কিন্তু কিন্তু মাঝি যেতে রাজি না! কারণ মাঝির সহকারীরা বেঁকে বসেছে। কী যেন অন্তর্গত কোন্দল। আমাদের সাথে আরো চারজন অভিযাত্রী আছে যারা ট্রলারেই যেতে চায়। তারা স্থানীয় এক বন্ধুকে ফোন করে ডেকে আনলো একটা ব্যবস্থা করতে। বন্ধুটি স্থানীয় চেয়ারম্যানের ছেলে সম্ভবত। এসে পাল্টা প্রস্তাব দিলো চার বন্ধুকে তার বাসায় রাত্রিযাপনের। সেখানে তরল, বায়বীয় নানান বিনোদনের আয়োজন আছে। আমরা যথাসাধ্য প্রলোভিত হওয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করছি। অবশেষে স্থানীয় বন্ধু ট্রলার ঠিক করে দিতে উদ্যোগী হলো। কিছু বেশি টাকায় ট্রলার ঠিক হলেও কর্তৃপক্ষ জানালো মাঝি আসতে কিঞ্চিত বিলম্ব হবে। বিলম্বকে তখন আর আমাদের ভয় নাই। টকটকে লাল রঙের মুরগির সালুন দিয়ে ভাত খেয়ে আমরা বিড়ি সিগ্রেট নিয়ে বসলাম। কাওসার আবীর তখন প্রায় মঙ্গলের কাছাকাছি, কয়েদি যাত্রা শুরু করে মহাশূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আর শাওন সাবধানী ভঙ্গিতে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে বসে আছে। মুক্তিবেগ অর্জনের সাহস বোধয় ভরদুপুরে করে উঠতে পারছে না।

বিকাল নাগাদ আমরা মাঝির দর্শন পেলাম। নাম ছদু মাঝি। আলকাতরা আর লোহায় তৈরি শরীর। নির্লিপ্ত, বিরক্ত তার আচরণ। তবে সাগরেদ বেশ রসিক। একটু পর বুঝলাম কলকিতে দম দিয়ে সে অনেক আগেই মঙ্গলে পৌঁছে গেছে। ইতোমধ্যে ভাটা শুরু হয়ে যাওয়ায় খালের পানি কমে গেছে। এখান থেকে ট্রলারে ওঠা যাবে না। হেঁটে যেতে হবে মোহনার কাছাকাছি। সেখানে ডিঙি নৌকায় চড়ে ট্রলার। আর ট্রলারটা লগি দিয়ে ঠেলে মোহনা পর্যন্ত নিয়ে যাবে মাঝি। মোহনায় গিয়ে প্রথম ভয় পেলাম ডিঙি নৌকা দেখে। সেটা অর্ধেক পানিতে ডুবে আছে। এক কিশোর পানি সেঁচার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। বালতি থেকে চামচ দিয়ে পানি সরালে যা ঘটবে ব্যাপারটা তেমনই মনে হচ্ছে। হাঁটু পর্যন্ত নৌকার খোলের পানিতে ডুবিয়ে বসলাম। আমুদরিয়া-

শিরদরিয়া পার হয়ে যখন ট্রলারে উঠলাম ততক্ষণে বয়স মনে হলো কিছুটা বেড়ে গেছে। দশজনের দলে সাঁতার জানে মাত্র দুজন!

ট্রলারটাকে মাঝনদীতে এনে মাঝি যখন স্টার্ট দেবে তখন জানা গেলো স্টার্ট দেওয়ার হাতলখানা সাথে নাই! সাগরেদকে গালাগালি করে নোঙর ফেলে ছদু মাঝি পানিতে লাফ দিয়ে নেমে যখন পানির উপর দাঁড়িয়ে পড়লো, আমার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। একটু পর বুঝলাম একটা টানা জালের উপর সে দাঁড়িয়ে আছে। দূরবর্তী এক ডিঙি নৌকাকে ডেকে সে রওনা দিলো হাতল আনতে। এদিকে আমরা বসে আছি তো আছি। ততক্ষণে কেয়ারী সিন্দবাদ ঢেউয়ের মাথায় আমাদের নাচিয়ে ফিরতি পথের যাত্রী। সাগরেদ ব্যাটা এক মায়ানমারফেরত ট্রলার দাঁড় করিয়ে হাতল ধার নিয়ে স্টার্ট দিয়ে ফেললো। এরপর সে বলতে লাগলো একাই নাকি আমাদের সেন্টমার্টিন নিয়ে যাবে! এই বলে নোঙর তোলার জন্য টানাহেঁচরা শুরু করেছে। আমাদের চিৎকার ব্যাটা পাত্তাই দিলো না। তবে নেশায় বিভোর থাকার কারণে নোঙর তুলতে পারলো না দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ ছদু মাঝি এসে হাজির হলো স্টার্টার নিয়ে। দুই হ্যাঁচকা টানে নোঙর তুলে সে ট্রলার ছেড়ে দিলো। শান্ত স্থির ভঙ্গিতে ট্রলার চলতে দেখে আমরা বোকার মতো একটু হাসলাম। মঙ্গলবাসীরা শুরু থেকে অকারণেই হাসছিলো। দুই একটা ছবিও তুললাম দিনশেষের আলোয়। তারা ভরা রাতে বামে মায়ানমার আর ডানে টেকনাফকে রেখে আমরা ভেসে যাচ্ছি।

ধাক্কাটা খেলাম আচমকা। নৌকাটা একই সাথে আনুভূমিক এবং উলম্ব অক্ষরেখা বরাবর দোল খেতে লাগলো। তাতে ছন্দের কোনো বালাই নেই। আরো ঘন্টাখানেকের মাথায় পানির ঝাপটা যখন শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে তখন কয়েদি হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেলো। দৃশ্যটা অভূতপূর্ব। সে চিৎকার করে গান গায়, সাগরকে কাঁচকলা দেখিয়ে তাকে গ্রাস করতে বলে, ছদু মাঝিকে আহ্বান জানায় জোরে ছোটার জন্য আর সৃষ্টিকর্তাকে থেকে থেকেই গালি দেয়। হেলাল আর রসু খাঁ শুরু থেকেই গলুইয়ের নিচে একটা খুপরিতে বসে আছে, ভাবখানা এমন মরি যদি তো চোখ বন্ধ করে ফেলবো। চারজন ভীত, তিনজন তরল, দুইজন নির্লিপ্ত আর একজন উন্মাদকে নিয়ে ছদু মাঝি মাঝ দরিয়ায় ভেসে যায়। অন্ধকারে তার চোখ ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে, সেখানে ভয়ের লেশমাত্র নেই।

রাত দশটায় যখন তীর দেখা গেলো ততক্ষণে আমরা প্রায় বোধশক্তিহীনে পরিণত হয়েছি। জেটিতে নেমেই আমরা কয়েকজন জীবিত থাকার আনন্দে কিছুক্ষণ শুধু শুধুই চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললাম। উদরপূর্তির পর বাসস্থানের সন্ধানে হেঁটে চললাম অন্ধকার এক পথে, বালুর উপর দিয়ে। গন্তব্য নেভি হেডকোয়ার্টার। শাওনের বড়ো ভাই নেভি অফিসার, আমাদের জন্য রেস্টহাউস বুকিং দিয়ে রেখেছেন। গিয়ে শুনি আমাদের সকালে আসার কথা বলে বিকাল নাগাদ অপেক্ষার পর তারা এক তরুণ দম্পতিকে রুম দিয়ে দিয়েছে। আরেক দফা মাথায় হাত। তবে কাওসারের একটু খটকা লাগলো। আমাদের দশজনের থাকার ব্যবস্থা নিশ্চয় এক দম্পতি দখল করে ফেলেনি!

একটু যুক্তি পালটা যুক্তি দেখাতেই লোকটা কেমন যেন ক্ষেপে গেলো। তার হম্বিতম্বিতে বিরক্ত হয়ে কাওসার এবার নিজের পরিচয় দিলো 'ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আলী কাওসার'। ঠকাশ করে কয়েকটা স্যালুটের পর দেখি বসার জন্য ব্যবস্থা হয়ে গেছে। একজন রুমের ব্যবস্থা করতে চলে গেলো। কিছুক্ষণের মাঝেই কিভাবে যেন রুম পাওয়া গেলো, তবে থাকার ব্যবস্থা মাটিতে, ঢালাও বিছানা। তাই সই। সারাদিনের ক্লান্তিতে অধিকাংশই চিৎ। কিন্তু কয়েকজনের হাতে দেখা গেলো বোতলবন্দি 'জিন'। তমাল আর শাওন উঠে গেলো কয়েদ থেকে জিনকে সাগরপাড়ে মুক্ত করতে, আর আমরা বেরসিকের মতো বেহুঁশ হয়ে গেলাম।

সকালটা অদ্ভুত, দরজা খুলতেই সমুদ্র, স্বচ্ছ নীল পানি, গম্ভীর প্রবালসারি, মাছ ধরার ট্রলার আর বাতাসে লবণের গন্ধ। জলকেলি করে, সৈকতে মধ্যবয়সি এক অভিযাত্রী দলের সাথে ফুটবল খেলে, কাঁকড়া- রুপচাঁদা- কোরাল দিয়ে উদরপূর্তি করে রেস্টহাউজে যেতেই আরেক দুর্ভোগ স্বাগত জানালো। এক মেজর জেনারেল সপরিবারে অবকাশযাপনে এসেছেন। আমাদের রুম ছেড়ে দিয়ে ব্যবস্থা হলো এক ভুতুড়ে বিল্ডিঙে। স্ট্রাকচারাল এঞ্জিনিয়ারিঙের জগতে সে এক বিস্ময়! বীমগুলো ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মতো বেঁকে গেছে, কলামগুলো কঙ্কালসার, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে মনে হয় এখুনি ভেঙে পড়বে, কয়েক টুকরা ইট খসেও পড়লো। যদিও সাথের তিন সিভিল এঞ্জিনিয়ার জানালো এটার নাকি এক্ষুনি ভেঙে পড়ার তেমন ভয় নাই। তেমন ভরসা পাই না। সন্ধ্যায় হেলাল আর নাঈম গেলো মাছ কিনতে, রাতে আগুনে ঝলসানো হবে। আমরা অন্ধকারে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় তীর বরাবর সেন্টমার্টিনকে চক্কর দিবো বলে হাঁটা ধরলাম। একটু পর দেখা হলো ছেঁড়াদ্বীপের একমাত্র বাসিন্দা হোসেন মিয়ার সাথে। তার কাছে যখন শুনলাম রাতে পথ ঝুঁকিপূর্ণ তখন উৎসাহ আরো বেড়ে গেলো। মাঝে মাঝে জঙ্গল, বিপদসংকুল প্রবালবিস্তৃত তীর আর তারার আলোয় ভৌতিক আকৃতি ধারণ করা অচেনা জগতের সেই চার ঘন্টা হাঁটার কথা যতবার মনে পরে ততবার শিহরিত হই।

পরদিন সকালে আবার হাঁটা, গন্তব্য ছেঁড়াদ্বীপ। শেষ ভূখণ্ডের শেষ প্রান্তে এসে সদ্য নোবেলপ্রাপ্ত ড. ইউনুসের আকর্ণবিস্তৃত হাসির অনুকরণে পোজ দিয়ে ছবিটবি তুলে ফিরতি পথে দেখি জোয়ারে ছেঁড়াদ্বীপ মূল ভুখণ্ড থেকে ছিঁড়ে গেছে। তাই পয়সা খরচ করে ট্রলারেই ফিরতে হলো। সেদিন বিকালেই ফিরে আসবো বলে মন বিষণ্ণ। কুতুবদিয়ায় চড়ে ফিরতি যাত্রায় জাহাজের সামান্য দুলুনিতেই যাত্রীরা যখন চিৎকার করে ওঠে, আমরা তাচ্ছিল্যের হাসি দেই। বাসে এক গোঁয়ার যাত্রীর সাথে হাতাহাতি করে বিভ্রাটের ষোলো কলা পূর্ণ করে রাজধানীর বুকে ফিরে আসলাম। সেন্টমার্টিনের প্রতি একবুক কাতরতার সেখানেই জন্ম।

বার্বাডোস: ছন্দ, ঢেউ আর আনন্দের দেশে

ধ্রুব বর্ণন

আমার ধারণা ছিলো না, আফ্রিকা-বংশোদ্ভূত কালো ভাইদের নিজেদের রাজত্বের একটা বেশ ধনী দেশ আছে, যেখানে তাদের মাথাপিছু আয় প্রায় ২২,০০০ ডলার। বার্বাডোসের কথা বলছি। বার্বাডোসের বাসিন্দা বেইজানদের কথা বলছি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্য দেশগুলোর অবস্থা এর চেয়ে খুব বেশি খারাপ না। ওরা বেশ ভালো আছে। সচ্ছল ও সুখে আছে।

মনটা ভালো হয়ে গেলো তাদের দেশটা দেখে। বিশ্বকাপ ২০১১ চলার সময়ে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশের সমর্থকরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাসে ঢিল ছোঁড়ার পরে। আশঙ্কায় ছিলাম কখন সেই কথাটা উঠে আসে, আর কতগুলো বেকুবের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করা লাগে। কিন্তু ওখানে গিয়ে ক্রিকেটের খুব আঁচ পেলাম না। রাস্তায় রাস্তায় কেউ ক্রিকেট খেললো না। গিয়েই প্রথম যে রেস্টুরেন্টে খেতে ঢুকলাম- ঢুকলাম বলা ঠিক না। কখনো ঢুকিইনি। রাস্তা থেকে সমুদ্রের দিকে একটু গেলেই দোকানের উঠোনে সমুদ্রের সামনে চেয়ার-টেবিল পাতা। ওখানে বসেই অর্ডার দেওয়া, খাওয়া, বিল দেওয়া সব সারলাম। কিন্তু রেস্টুরেন্টের ঘরের ভেতরে টিভিতে চলছিলো রাগবি খেলা আর রাগবিপ্রিয় ট্যুরিস্টদের হৈ চৈ। ভাবলাম, ভালো। ক্রিকেটের কথা তুলতে হলো না। ক্রিকেট আর মাথাপিছু আয় কোনোটাতেই তোমাদের সাথে আমরা সুবিধে করতে পারবো না!

এই সুবিধে করতে না পারার মধ্যে একটা ভালো লাগা ছিলো। বার্বাডোসে যাবার আগে সদ্যই এডমন্টনে, এক ছোট ভাইয়ের সাথে আফ্রিকা-বংশোদ্ভূত কালো ভাইদের নিয়ে ভীষণ তর্ক হলো। সে নানা তথ্য উপাত্ত ও অভিজ্ঞতার ইশারা-ইঙ্গিত দিয়ে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো, কালোরা নাকি ভালো না। তারা খারাপ টাইপের। তাদের থেকে চৌদ্দহাত দূরে না থাকতে পারলে নাকি নিরাপত্তা নিয়ে সন্দেহ যায় না। আমি বলি, কালোরা ভালো না, তো আমরা কী? তাছাড়া এডমন্টনে এত এত আফ্রিকা-বংশোদ্ভূত কালো ভাই থাকে না যে সে পরিসংখ্যান দিয়ে কিছু একটা খাড়া করবে, যেটা আমি আবার পরিসংখ্যান দিয়ে খণ্ডাবো। এই আলোচনার যে অমানবিক বর্ণবাদী সুর, সেটার উপর জোর দেওয়াই তখন ভরসা ছিলো।

আর এখন তো নিজের চোখে দেখলাম। সবকিছু কত গোছানো, পরিষ্কার। নিরাপদ। নির্জন রাস্তা দিয়ে লিজা আর আমি ফিরছি ঘরে। মাঝে মাঝে দুয়েকজন কালো ভাই পার হচ্ছে আমাদের, যারা কিনা সম্ভবত মদ্যপান করেই ফিরছে, কিন্তু আমাদের চেনা অনেক শহরের মানুষের চেয়েই বিনীত! এবং হাজারগুণে বেশি আনন্দপ্রবণ। ওদের জীবনটাই হলো খুব ফুর্তিময়। প্রতি মুহূর্তটাই ওদের যেন ফুর্তি। প্রতিটা কথা যেন তারা বলে দুলে দুলে। সুর করে। আমার ওদের ভালো লেগে গেছে। ওহে এডমন্টনের ছোট ভাই। কালোরা ভালো! অনেকে বলবে বর্ণ নিয়ে কথা বলাটাই বর্ণবাদী। কিন্তু আমি বলি- বর্ণকে ভালোবেসে কি কেউ আদৌ বর্ণবাদী হতে পারে?

আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে দ্বীপ- বার্বাডোসে আমরা একটা বড়োসড় রিসার্চ গ্রুপ গিয়ে হাজির হয়েছি একটা ওয়ার্কশপ উপলক্ষ্যে। উঠেছি বেলেয়ার্স রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান এই বেলেয়ার্সে মূলত মেরিন বায়োলজি, জিওগ্রাফি, ইকোলজি গবেষণার ফিল্ড স্টাডি হয়ে থাকে। বাকি সময়ে ওখানে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ আয়োজন হয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ওখানে

গবেষকদের সস্ত্রীক খুব অল্প খরচে থাকার এবং খাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা আছে। বিশেষ করে যেখানে কিনা পাশের হোটেলটাতেই রুম ভাড়া ৬০০ মার্কিন ডলার! আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা, রিসার্চ ইন্সটিটিউটটা মহাসাগরের ঠিক পাশে। আমার রুম থেকে মেপে মেপে বিশ কদম হেঁটে গেলে মহাসাগর আটলান্টিক!

বেলেয়ার্স রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে বিশ কদম হেঁটে মহাসাগর আটলান্টিক

নীলাভ সবুজ সমুদ্র। বেলেয়ার্সের তীরে একটা পাশে বিশাল অঞ্চল জুড়ে বার্বাডোসের সবচেয়ে বড়ো প্রবালশ্রেণী। অন্যপাশে বেশ শান্ত সমুদ্র। আরাম করে তাতে শুয়ে থাকা যায়। কিন্তু মূল আকর্ষণ সমুদ্রের পৃষ্ঠে নয়, নিচে। প্রবালকে ঘিরে আছে সারি সারি রঙবেরঙের মাছের বাস। সেই দৃশ্য না দেখে ফেরত যাওয়া বৃথা। তাই সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম আমরা মাস্ক, স্নর্কেল আর ফিন। স্নর্কেল হলো পানির নিচে শ্বাস নেবার একটা বিশেষ ধরনের নল, যার এক দিকের মুখ থাকবে সাঁতারুর মুখের ভেতরে, আর অন্যদিকের মুখ থাকবে সাঁতারুর মাথার পেছনে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে, বাতাসে। যাতে করে সাঁতারুর নাকমুখ পানির নিচে থাকলেও সে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে পারে। তবে সাগরতলে মাছের রাজ্য দেখতে হলে চোখটাও পানির নিচেই থাকতে হবে।

মাস্ক, স্নর্কেল আর ফিন পরে আটলান্টিকের বুকে সাঁতার

লোনা পানি চোখে ঢুকে গেলে খুব ভালো লাগে না। তাই পরতে হয় মাস্ক, যেটা নাকসহ চোখের আশপাশে বাতাস ঢুকতে না পারার মতো আটকে থাকে। আর ফিন হলো মাছের লেজের মতো দেখতে পায়ে পরার ডানা। ওটা পরলে পানিতে দ্রুত ও আয়েশে সাঁতার কাটা যায়।

এইসব পরেটরে লিজা আর আমি আটলান্টিকে। একজন আরেকজনের সাথে পানির নিচে সাক্ষাৎ! পানির নিচে আমাদের যেন নতুন করে পরিচয়। এক নতুন সঙ্গীর সাথে পরিচিত হলাম আমি। নিজেদের মনে

হলো জলজ প্রাণী। আমাদের কাজ কেবল পানির নিচে সাঁতরে বেড়ানো। দুজনে দুজনার হাত ধরে পানির নিচে আটলান্টিকে ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা। আমাদের আশেপাশে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়িয়েছে নানা রঙের মাছ।

মাছের সাথে সাক্ষাৎ! ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে যাচ্ছি। প্রবালের ধারগুলো সাগরতল থেকে পৃষ্ঠের মাত্র এক মিটার নিচ পর্যন্ত উঁচু। ওগুলো এই অঞ্চলে সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে। তাতে স্পর্শ করলে, হাত-পা রাখলে ওগুলোর ক্ষতি, আমিও আহত হতে পারি। তাই ধারগুলোর ফাঁক গলে গলে চলছি। সাগরতলের রাজ্যটাকে দেখছি। হঠাৎ দেখি আমার সাথে সাথে দল বেঁধে কতগুলো মাছও সাঁতার কাটছে। আমার মাথার সামনে দুটো, আমার দুপাশে আর পায়ের পেছনে আরও কতগুলো। এক কবজি সমান ছোট ছোট কতগুলো মাছ কী ভেবেছে আমাকে কে জানে, আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। তাদের সাহচর্য বেশ ভালো লাগছিলো। তখনই নিচে দেখতে পাই প্রবালকে ঘিরে নানা রঙের আরও অনেকগুলো মাছ। কিছু মাছ, হলুদের উপর তার জেব্রার মতো কালো ডোরাকাটা। আরেকটা দেখি বেগুনি রঙের। ওরা ছোট, কব্জির অর্ধেক হবে। ভীতু, চঞ্চল। প্রবাল থেকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আরও এগিয়ে দেখলাম, একটা প্রবালের নিচে একটু ফাঁক আছে। ছায়া পড়েছে ওখানে। একটু অন্ধকার। আর ওখানে সারি বেঁধে বিশ-পঁচিশটা হলুদ রঙের মাছ ঘুমোচ্ছে। পানির তরঙ্গে একটু একটু দুলছে তারা। কিন্তু আর কোনো নড়াচড়া নেই!

প্রবালের অন্য পাশেই হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা প্যারোট মাছ। প্রায় এক হাত লম্বা। ফিরোজা রঙের মাছ, পেটের দিকে বেগুনি আর পিঠের দিকটায় ম্যাজেন্টা রঙের শেড। কী অদ্ভুত সুন্দর সে রঙের বাহার! বিশাল এই প্যারোট মাছ একা একা স্বেচ্ছাচারী রাজার মতো প্রবালের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। আর প্রবালের গা থেকে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। আমি স্থির হয়ে তাকে দেখতে থাকি। তার রঙকে দুচোখ ভরে উপভোগ করতে থাকি। সে পাশ ফিরে ফিরে আমাকে দেখে। তারপর সরে গিয়ে আরেকটা প্রবালে গিয়ে আবার খেতে থাকে। আমি চুপিচুপি তার পিছে পিছে গিয়ে আবার স্থির হয়ে তাকে দেখতে থাকি। হঠাৎ শুনতে পাই। তার প্রতিটা কামড়ে পানির নিচে খচখচকরে শব্দ হচ্ছে। বেশ ধারালো কামড় বসিয়ে বসিয়ে সে খাচ্ছে! আমি নড়াচড়া একদম বন্ধ করে দেই। স্থির হয়ে শুনতে থাকি প্যারোটের কামড়ের শব্দ। খচ। খচ। . . . খচ। তারপর সে হঠাৎ খাওয়া ছেড়ে দৌড়াতে থাকে। আমি তার পিছে পিছে যেতে থাকি। একটা প্রবালের সামনে এসে একটু থামে। তারপর আবার সে খুব দ্রুত সাঁতরে সাঁতরে গভীরে চলে যায়। অনেকক্ষণ তার পিছে পিছে এগোই। একসময় সে তলদেশে চলে যায়। মাথা তুলে দেখি, আমাকে সে ততক্ষণে নিয়ে এসেছে তীর থেকে বেশ দূরে। মাছেদের সাথে সাঁতার কেটে কেটে আবার ফিরে আসি তীরে।

সমুদ্রস্নান সেরে ফিরে আসছে অভাজন ধ্রুব বর্ণন

পাহাড়ের উপর থেকে ক্রেইন সৈকত

এমনই অদ্ভুত সুন্দর বার্বাডোসের সমুদ্র। আরেকদিন বোটে করে দল বেঁধে গিয়েছিলাম সমুদ্রের আরও গভীরে। ওখানে পানিতে স্নর্কেল নিয়ে নামলে একটা ডুবে যাওয়া জাহাজ দেখা যায়, আর তার আশেপাশে অজস্র হাজার রঙের মাছ। ওখান থেকে আরেকটু দূরে পানিতে নামলে কচ্ছপ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক অনেক কচ্ছপ। মাঝে মাঝে সমুদ্রের উপরে মাথা তুলে তারা দেখে। তখন বোট থেকেও তাদের দেখা যায়। তবে স্নর্কেল নিয়ে নামলে কচ্ছপের সাথে সাঁতার কাটা যায়। তার পিঠে হাত বুলানো যায়। অদ্ভুত শান্ত সৌম্য এই প্রাণী। কোনো জন্মে কচ্ছপ হয়ে জন্মালে ভালো হতো। খোলের ভিতর চড়ে সমুদ্রে ঘুরে ফিরে বেড়াতাম। চলাফেরার কি আয়েশি স্বাধীনতা!

নাচ, গান, হৈ-হুল্লোড়; বার্বাডোসে রাতের জীবন

বার্বাডোস ভ্রমণের শেষদিকে আমরা গিয়েছি দ্বীপটার একেবারে দক্ষিণে, অয়েস্টিনসে। ওখানে শুক্রবার রাতে মেলা হয়, উৎসব হয়। হৈ হুল্লোড়। আমরা গিয়ে দেখি সমুদ্রপাড়ে সারি বেঁধে একেকটা দোকানে দেশি রামে মাছ ফ্রাই আর গ্রিল চলছে। বিখ্যাত আংকেল জর্জের দোকানে লাইন দিয়ে দিলাম। ব্লু মারলিন, সোর্ড মাছ, মাহি মাহি, চিংড়ি, টুনা, কত রকমের মাছ! বেশ কয়েকটা চেখে নিলাম। এর মধ্যে ব্লু মারলিনের গ্রিল অদ্ভুত, অসাধারণ! ব্লু মারলিনের একটা বিশাল খণ্ডের গ্রিলকে কখনো গরুর চাপ বলেও ভুল হতে পারে।

খেতে খেতে শুনি এক দিকে বেশ হৈচৈ। গিয়ে দেখি একটা মঞ্চের মতো। তাতে জোরে গান বাজছে আর সাথে নাচছে বার্বাডোসের মাইকেল জ্যাকসনরা। তাকেই যে ওরা গুরু মানে! মাইকেল জ্যাকসনের গান ছেড়ে দিয়ে সে কী ব্রেকড্যান্স! দল বেঁধে টুরিস্টেরা মঞ্চ ঘিরে

মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকে আর নাচতে থাকে। আমরাও নাচতে থাকি গানের তালে। আমরা মিশে যাই কোলাহলে। গান, নাচ, হাজার মানুষের ভিড়, হৈচৈ। এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি হতে থাকে তখন। ঘোরধরা পরিবেশ। বার্বাডোসের মানুষদের আনন্দময় জীবনটার যে ছন্দ, তার ভেতরে আমরা ঢুকে যেতে থাকি। আনন্দফুর্তিতে, নাচের তালে তালে আমি আর লিজাও ক্ষণিকের জন্যে হয়ে উঠি বেইজান!

ভালো লাগার মতো দেশ, ভালো লাগার মতো মানুষ। উপভোগ করার মতো রাতের জীবন। খাবার, পানীয়। তাপমাত্রা বাংলাদেশের গ্রীষ্ম কিংবা শরতের মতো। ভাষা ইংরেজি। সব জায়গায় মার্কিন ডলার চলে। ফিরে আসবো, আগের দিন রাতে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। সেখানে বারটেন্ডার শুধালো, কোন দেশের মানুষ আমরা। বাংলাদেশ শুনতেই হেসে ওঠে। ওহ্! ওই দেশ! যেখানে তোমরা আমাদের খেলোওয়াড়দের গাড়িতে ঢিল ছুঁড়েছো। তাজ্জব কি বাত তো তোমাদের! আমি আর লিজা বিনীতভাবে দুঃখপ্রকাশ করি। বলি, কেউ কেউ ঢিল মারতে পারে, কিন্তু সবাই কিন্তু তোমাদের ভালোই বাসে। বারটেন্ডার বলে। ধুর। এসব স্যরিটরি হতে হবে না। আমরা জানি, আমরা আবার তোমাদের দেশে গেলে তোমাদেরকে আবারও ঢিল ছুঁড়তে হবে, এবং আবারও স্যরিই হতে হবে। সো ফরগেট অ্যান্ড হ্যাভ ফান! হেসে বলে আমাদের বেইজান ভাই। একে বলে ক্রিকেট স্পিরিট। একে বলে জওয়াব! বার্বাডোসের সুখী মানুষগুলো ভালো থাক। আরও উন্নতি করুক আটলান্টিকের বুকে। আমরা প্রকৃতি আর জীবনের এক অদ্ভুত মিতালিকে কাছে থেকে দেখার ভালো লাগা নিয়ে ফিরে এলাম।

সোনালি ডানার দিন

সুলতানা পারভীন শিমুল

অনেকদিন থেকেই ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না রোগে আক্রান্ত। গোপন সূত্রে খবর পেলাম লোকজন কুষ্টিয়া যাচ্ছে , লালন মেলায়। আগের রাতে হুট করেই নজু ভাইকে ফোন করি। "আমি শিমুল"। ওপাশে চুপচাপ। এবার পরিষ্কার করে বলি, "আনোয়ার সাদাত শিমুল না। সুলতানা পারভীন শিমুল।" তখন তিনি বলে ওঠেন, "ওহ, শিমুল আপা! " আমি আর কোনো কথা না বলে বলি, "কুষ্টিয়া যাচ্ছেন শুনলাম? আমিও যাবো।" ব্যস হয়ে গেলো।

পরদিন রীতিমতো বিদ্রোহ করেই বোনের অবাক হওয়া বড়ো বড়ো ডাগর আঁখির সামনে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ভেতরে টগবগ করে ফুটছি। এই প্রথম একা একটা অচেনা শহরে যাচ্ছি। প্ল্যান করে করে প্রচুর প্ল্যানিং পানিতে পড়েছে। লোকজন হাসাহাসি করতে শুরু করায় এবার আর কাউকেই বলিনি। কিন্তু এবার সত্যিই যাচ্ছি।

সিট নাই সিট নাই। কথাবার্তা থেকে বুঝলাম, এই অতিরিক্ত ভিড়ের কারণ, লালন উৎসব। গাড়ির ভেতরে পা রাখার জায়গা নেই। যেতে চাইলে ইঞ্জিনের ওপর বসে যেতে হবে। তাই সই। সেখানেই আরো চারজন মহিলার পাশে ঠেলেঠুলে জায়গা করে নিলাম। বিনা যুদ্ধে নাহি দিবো সূচাগ্র মেদিনী...। গাড়ি বগুড়া ছাড়লো যখন, তখন বেলা এগারোটা। পুরো রাস্তা এলাম সামনের কনডাক্টর আর হেলপারের গল্পগুজব শুনতে শুনতে। এরাও রাজশাহীর লোকের মতোই বেশ মিষ্টি করে কথা বলে তো! একটা সুরেলা টান আছে কথায়। শুনতে ভালো লাগে। কনডাক্টর কঠিন কঠিন সব সিদ্ধান্ত দিচ্ছে হাসিমুখেই। একটু পরে ওই এলাকার প্রভাবশালী এক লোকের আত্মীয় উঠে “সিট নেই কেন” বলে ঝামেলা শুরু করলো। যেভাবেই হোক তাকে বসতে দিতেই হবে, নাহলে সে দেখে নেবে। এই জাতীয় সমস্যা শুরু করলো যখন, কনডাকটর তাকে তার টিকেটের টাকাটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মাঝপথে নামিয়ে দিলো। এই কাজটাও করলো সে বেশ শান্ত ভঙ্গিতে। প্রত্যাশিত উত্তেজনা নেই। অবাক এবং মুগ্ধ হলাম। বগুড়ার লোক হলে তো ওখানেই তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যেত। এপক্ষ ওপক্ষ, দুপক্ষেরই।

যখন কুষ্টিয়া নামলাম, তখন প্রায় আড়াইটা। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই নজু ভাইরা পৌঁছে যাবেন বলে জানালেন। আমাকে বলা হলো, একটা হোটেল খুঁজে বের করতে। রিকশায় উঠে রিকশাওয়ালাকে বলি ভালো একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতে। সে আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী যেন দেখায় আর বোঝায়। আর বলে, "সব তো এখন বন্ধ। বিকেলে খুলবে।"

অনেকক্ষণ পরে বুঝতে পারি, সে ভেবেছে আমি ফুচকা বা চটপটি খেতে চাচ্ছি। তাই সে আমাকে ডিব্বাওয়ালা দোকানগুলো দেখাচ্ছে আর বলছে, "দেখেন, সব রেস্টুরেন্টই এখন বন্ধ।" নিজ উদ্যোগে এবার একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করি। কিন্তু খাবার আসতেই সময় অনেক লেগে যাবে বিধায় সেটা বাতিল করা হলো। তারপর যে হোটেল খুঁজে বের করি, সেটার নাম "মউবন"। সেটাকেও বাই বাই বললাম। কারণ এর মধ্যেই জানলাম, ওরা অলরেডি একটা হোটেলে ঢুকে পড়েছে। হোটেলের নাম, জাহাঙ্গীর হোটেল। রিকশা ঘুরিয়ে নিলাম।

হোটেলে ঢুকেই দেখলাম, নজু ভাই ফোনে ব্যস্ত। সেই অবস্থাতেই আমার দিকে মিষ্টি একটা হাসি ছুড়ে দিলো। নূপুর, দীর্ঘ পথশ্রমে একটু ক্লান্ত, কিন্তু সৌন্দর্যে তার বিন্দুমাত্র ছাপ নেই, যথারীতি উজ্জ্বল। ওর

পাশে আরেকজন সুন্দরী বালিকা। মিশা, নূপুরের বোনের মেয়ে। তাকে আবার আমি অন্য কেউ বলে ভুল করেছিলাম। "কে" ভেবেছিলাম, তা বলবো না। ;-) বুনোহাঁস শেষমেষ আসতে পারছে না জানতাম। কিন্তু বালিকাকেও দেখতে পাবো না, জানতাম না। একটু আপসেট হলাম। অন্য টেবিল থেকে হাত নাড়লো রায়হান। আমাকে "হাই" বলে আর এক টুকরো হাসি মুখে নিয়ে প্লেট হাতে ওদিকে চলে গেলো বিডিআর। আরিফ ভাই আমার দিকে তাকিয়ে প্রথম যে কথাটা বললেন, "এই শিমুল, আপনি কী খাবেন, মুরগি না খাসি?" আর খাওয়াদাওয়া শেষ করার পরে চিনলাম কে সংশপ্তক।

ব্যস। আমরা এই কজন। আমার জন্য ফিফটি ফিফটি। নজু ভাই, নূপুর আর রায়হানকে আমি আগে থেকেই চিনি। ওদের সাথে এটা আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। আরিফ ভাই, বিডিআর আর সংশপ্তককে এই প্রথম দেখলাম।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে গাড়ি ছুটলো মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে রাজ্যের গল্পগুজব। বই খাতা গান কবিতা নিয়ে মহাব্যস্ত নিধি। সে আবার একটা সময়ে নজু ভাইকে ধমকও দিলো, "তুমি এত কথা বলো কেন, বাবা?" আরিফ ভাই বসেছে একদম সামনের সিটে। একটু পর পর বিভিন্ন কথার মাঝেমাঝেই তিনি "সানগ্লাস একটা কিনতেই হবে" জাতীয় শপথ নিচ্ছেন। এক ফাঁকে বিডিআর নিধিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, "তুমি কাকে বেশি পছন্দ করো, নিধি? খালেদাকে, না হাসিনাকে?" নিধির স্বতস্ফূর্ত জবাব, "আম্মুকে"। তুমুল হাসির রোল উঠলো।

গাড়ি চলছে। কোনো যানজট নেই। চওড়া রাস্তা। ঢাকাবাসী সব মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আরিফ ভাই, নজু ভাই, রায়হান, বিডিআর, সংশপ্তক, এরা সবাই কুষ্টিয়ায় জমিটমি কিনে রীতিমতো বাড়িটাড়ি বানিয়ে ফেললো। নূপুরও এর সাথে ভালোমন্দ দিক যোগ করে দিচ্ছে। শ্রোতা আমি আর মিশা।

মুজিবনগর। গন্তব্যে পৌঁছলাম যখন, তখন পড়ন্ত বিকেল। স্মৃতিসৌধের দিকে হাঁটছে সবাই। কেউ আগে আর কেউ পরে। দুইপাশে বটবৃক্ষের মতো বিশাল সব আমগাছ। অনেকগুলো পিকনিক পার্টি হৈ হুল্লোড়ে ব্যস্ত। রায়হানের কোলে নিধি। ও বোধহয় ওর আম্মুর কথা জানতে চাইলো। রায়হান এক মহিলাকে দেখিয়ে বললো, "ওই যে ওটা তোমার আম্মু।" একটু পরে নিধি আবার আমার কোলে। এটা সেটার পর জিজ্ঞেস করে, "আম্মু কোথায়?" আমি একটু সামনে এগিয়ে থাকা নূপুরকে দেখিয়ে বললাম, "ওই যে আম্মু"। এবার রায়হানকে দেখিয়ে ওর কথা, "তাহলে ও যে বললো, ওইটা আম্মু..." বোঝো অবস্থা!

আরেকটু হাঁটি আমরা। ওয়াও! ওটা কী! বাইশটা স্তম্ভ নিয়ে অর্ধ-বৃত্তাকারে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে স্মৃতিসৌধটা। দেখে বুকের ভেতরটাও ভরে উঠলো গর্বে আর ভীষণ ভালোলাগায়। এই জায়গাটা তুলনামূলকভাবে অনেক শান্ত। স্যান্ডেল-জুতা খুলে আমরা পুরোটা জুড়ে ঘুরে বেড়াতে থাকি। ফটোসেশন চলতে থাকে। স্তম্ভগুলোর ওপরে উঠেও ছবি তুলছে কেউ কেউ। আমারো খুব ইচ্ছে করছিলো ওর একটাতে তরতর করে উঠে আশেপাশে চোখ বুলাতে। কিন্তু আমার লজ্জা তখনো অতোটা ভাঙেনি। এইখানে দেখা হয়ে গেলো মহামতি লীলেন আর তার বৌ-ম্যাডামের সাথে। ওরা অবশ্য হাই-হ্যালো বলেই ওদের গ্রুপের লোকজনের কাছে চলে গেলো। আর ক্যামেরা নিয়ে তক্কে তক্কে থাকলেন আরিফ ভাই, একজন যদি কেউ ভুল করেও শুধু জুতোপায়ে স্মৃতিসৌধের ওপরে পা রাখে, সাথে সাথেই হয়ে যাবে খবর! কিন্তু তার ইচ্ছে পূরণ হয় না। আমরা বোধহয় ঠিকঠাকমতো শ্রদ্ধা জানাতে শিখে গেছি।

আলো আরো নরম হয়ে আসছে। আরেকটু হেঁটে আমরা ঢুকে গেলাম বিশাল একটা স্টেডিয়ামের মতো দেখতে, তার ভেতরে। ভেতরে অনেক অনেক বড়ো একটা সবুজ বাংলাদেশ বুক চিতিয়ে শুয়ে আছে। মানচিত্রের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সময়কে ধরে রাখা হয়েছে

ছোটো ছোটো স্ট্যাচু আর কনস্ট্রাকশন বসিয়ে। বঙ্গোপসাগরের দিকটায় দিব্যি পানি। দারুণ লাগলো!

এর মধ্যে টের পেলাম, আমি মিশা আর নিধি ছাড়া আশেপাশে আমাদের আর কেউ নেই। বিডিআর আর সংশপ্তক মাঝে মাঝে দূরে বিজলির মতো দেখা দিয়েই আবার হারিয়ে যাচ্ছে। ওরা ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। সন্ধ্যা নামার মুখে বাকি লোকজনকে খুঁজে পাওয়া গেলো চায়ের দোকানে। কেউ কেউ চা খেলো। ঘোরাঘুরির পুরো সময়টা রায়হান ছিলো একেবারেই লাপাত্তা। কই ছিলো কে জানে! সবগুলো পিস একসাথে হলে গাড়ির দিকে ফিরতে থাকি আমরা। আলতো পায়ে। কারো তাড়া নেই। লম্বা লম্বা গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা আকাশ। আকাশে চাঁদ। পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসা বিশাল একটা চাঁদ। যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকু, বেশিও না, কমও না, অদ্ভুত বাতাস চারদিকে।

ফিরলাম হোটেলে। হোটেলের নাম "পদ্মা"। কয়েকটা ভুল রুমে ঢুকে ঢুকে শেষে আমাদের জন্য নির্ধারিত রুমে ঢুকলাম। ছোট্ট ছোট্ট খুপড়ি। প্রতিটা খুপড়িতে খুবই স্লিম দুটো করে বিছানা। কথায় বলে, যদি হয় সুজন, তেতুল পাতায় ন'জন। আমাদের কোনো সমস্যা নেই। যদিও মিশার কাছে এসব খুব অন্যরকম। নতুন। সে বারবার অবাক হয়ে বলছে, "ছেলেরা কী বলছে জানো? একটা বিছানা, যেখানে ছারপোকা নেই, যে রুমের সাথে একটা বাথরুম আছে, বাথরুম থেকে বাজে গন্ধ আসছে না, সেই বাথরুমের নল দিয়ে আবার পানিও পড়ে! এরচেয়ে বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে!" বলেই অবাকমাখা হাসি। হোটেলে প্রচুর সিলেটি মানুষ। অনেকের শুধু নাম শুনেছিলাম। এই ফাঁকে দেখাও হয়ে গেলো। একজন আবার সিলেটের লোকেরা প্রমিত বাংলা উচ্চারণে কথা বলে, আর এরকম কেউ পারে না বলে কলার ঝাঁকিয়ে গেলেন।

যারযার মতো ফ্রেশ হয়ে, প্রায় ঘন্টাখানেকের একটা জম্পেশ আড্ডা হলো। আড্ডায় আরিফ ভাই বারবার বিভিন্ন ব্যাপারে বাজি ধরতে চাইলেন। আর বাজিতে হেরে গেলে অন্যপক্ষ যা খেতে চায়, খাওয়াবেন তিনি। টাকা ইজ নো প্রবলেম। যত খাবি, খা। আসল ব্যাপারটা বোঝা গেলো খেতে গিয়ে। সব মিলিয়ে ১৪ জন লোক আমরা ইচ্ছেমতো পরোটা, ভাত, মাংস, মুরগি, বড়ো মাছ, ইত্যাদি খেয়েও বিল আসলো মাত্র সাতশো তেতাল্লিশ টাকা! সবাই বলেন, আলহামদুলিল্লাহ!

খেয়েদেয়ে রাত দশটার দিকে আমরা যাত্রা শুরু করি। এবার লালনের আখড়ায়।

ওখানে ঢুকে অদ্ভুত লাগলো। একেবারে অন্যরকম একটা পরিবেশ। মূল ভবনের বিশাল জায়গা জুড়ে কোথাও পলিথিন আর কোথাও চাটাই বিছানো। কেউ বসে আর কেউ শুয়ে আছে। সাদার আধিক্যের কারণে কি না জানি না, মনে হচ্ছিলো, অনেকগুলো লাশ নিয়ে কিসের যেন অপেক্ষায় বসে আছে অসংখ্য মানুষ। মিশাকে বলতে সে বললো, ওরও একইরকম অনুভূতি হয়েছে। এখানে ওখানে জটলা বেঁধে বাউলরা গান করছে। আমরা ঘুরে ঘুরে মেলার ভেতরে এসে পড়ি।

প্রথমেই চোখে পড়লো নাগরদোলায়। মানবচালিত। আরিফ ভাই, নজু ভাই আর সংশপ্তককে রেখে আমরা বাকি সবাই উঠে বসি একটাতে। ওপরে উঠিয়ে যখন ধপাস করে নিচে ছেড়ে দিলো। শুরু হয়ে গেলো মা-মেয়ের প্রতিযোগিতা। কে কার চেয়ে জোরে চিৎকার করতে পারে। নিধি কেঁদে ফেললো। ওকে নামিয়ে দিয়ে নাগরদোলা আবার চললো। নূপুর ভয়ে চোখ বন্ধ করেই থাকে। রায়হান আর বিডিআর বিভিন্ন কথায় সাহস দিতে দিতে অবশেষে অবশেষে খুকি চোখ খুললো। তারপর তার খুশি দেখি কে! উচ্ছসিত কণ্ঠ তার, "আরে! অনেক মজা তো!"

ঘরতে ঘুরতে অনেকগুলো ছোটো ছোটো রঙিন বেলুন দেখে সবার বন্দুকবাজ হওয়ার শখ হলো। কয়েকটা লক্ষ্যভেদ আর কয়েকটা মিস করে শুভ সূচনা করলো বিডিআর। তারপর নজু ভাই। সবকয়টা লক্ষ্যভেদ করে, "কিলার" "ক্যাডার" এইসব বিশেষণে ভূষিত হতে হতে সে জিতে নিলো দুটো বোনাস গুলি। এরপর আরিফ ভাই, রায়হান আর সবশেষে মিশা। সবাই তো দেখি সেইরকম বন্দুকবাজ! বাচ্চাদের মতো উচ্ছসিত মিশা। এইরকম বন্দুকবাজির স্বপ্ন তার বহুদিনের। আজ পূরণ হলো। সবার কেরামতি দেখে আমি নিজের নৈপুণ্য দেখানো থেকে বিরত থাকলাম। মান ইজ্জত সবারই আছে। নূপুরও খুব একটা আগ্রহ দেখালো না।

মৃত্যুকূপ- আগে শুধু সিনেমায় দেখেছি। সামনাসামনি দেখার অভিজ্ঞতা সাংঘাতিক। মাটির একটা বিশাল কূপের ভেতর তীব্র গতিতে মোটর সাইকেল চলন্ত অবস্থায় শার্ট চেঞ্জ করা, সিগারেট ধরানো, হাত ছেড়ে দিয়ে বসা, ইত্যাদি ইত্যাদি। মিশা আমার হাত খামচে ধরে থাকলো যতক্ষণ শুকনোপটকা লোকটা তার কারিশমা দেখালো।

ওখান থেকে বের হয়ে আমরা ইতিউতি ঘুরতে থাকি। সবাই টুকটাক কেনাকাটা করতে থাকে। আমি শুধু দেখি। বেড়াতে গিয়ে দেখাদেখিতেই আমার যত আনন্দ। আরিফ ভাই এর মধ্যে পঞ্চাশ টাকায়, ভীষণ দামি লুক দেয়, এরকম একটা সানগ্লাস কিনে ফেললেন। এবং এত সুন্দর একটা জিনিস নষ্ট যেন না হয়, সেজন্য সেটা শুধুমাত্র টিশার্টের সাথেই ঝুলিয়ে রাখবেন বলে সবার সামনে সিদ্ধান্ত নিলেন। সবাই কাড়ি কাড়ি গামছাও কিনলো।

এত এত উৎসবমুখর চারদিক! ভালো লাগা যেন রেণুর মতো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে চারদিকে। হাঁটতে ভাল্লাগছে, আশেপাশে দেখতে ভাল্লাগছে, কেউ হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজতে ভাল্লাগছে, বিডিআর "আন্টি আন্টি" করে জ্বালাচ্ছে, তার হাড্ডিগুড্ডি ভেঙে দেওয়ার ইচ্ছেটাও ভাল্লাগছে। আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে...

আরিফ ভাই আর সংশপ্তককে মেলাতে রেখে আমরা যখন হোটেলে ফিরি রাত তখন দুটো পেরিয়ে গেছে। কেউ অবশ্য সেটা বলবে না। মেলায় তখনো তরুণী রাত।

পরদিন। আটটা বেজে যায়, ঘুম থেকে কারো ওঠার নামগন্ধ নেই। অথচ আগেরদিন ছেলেদের লাফালাফি, খুব সকালে কিন্তু রওয়ানা দিতে হবে! কারো যেন দেরি না হয়! নূপুর নিজে রেডি হয়ে, ঘুরে ঘুরে সব ছেলেদের ঘুম ভাঙিয়ে এলো। অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো, সকালের নাশতা হবে "মউবন" হোটেলে। সবাই গাড়িতে উঠে বসলো। কিন্তু গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে...। আজ ভয়াবহ যানজটের কবলে কুষ্টিয়া। এর আগে যারা যারা কুষ্টিয়ায় বাড়িগাড়ি করে ফেলেছিলো, তারা আবার সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে ঢাকাতেই থাকা মনস্থির করলো। জ্যামই যখন খেতে হবে, ঢাকারটাই খাওয়া ভালো। অবশেষে মউবন। বাইরে থেকে দেখে হোটেলটা ছোটো মনে হচ্ছিলো। ভেতরে দেখা গেলো যথেষ্ট বড়ো। সবাই ইচ্ছেমতো অর্ডার দিলো। পরোটা, খিচুড়ি। তারসাথে যা খুশি। আরিফ ভাই আর নজু ভাই সবাইকে লজ্জাশরম দূরে রেখে প্রাণ ভরে খেতে বললো। বিল বাড়াতেই হবে, এই উদ্দেশ্যে মিঠাই-মন্ডা-দই, এসবও খাওয়া হলো। তারপরেও, তারপরেও বিল একহাজার ছুঁতে পারলো না। আফসোস! এই ঘটনায় বিশেষ করে রায়হান, আর বিডিআর, ঢাকাবাসী হিসেবে তীব্র অপমানিত বোধ করলো।

তারপরের গন্তব্য, শিলাইদহ ঠাকুরবাড়ি। যাবার পথে একটা ওষুধ কেনার জন্য আরিফ ভাইকে মাথার ঘাম প্রায় পায়ে ফেলতে হলো। অথচ ওষুধের দোকানের চেয়েও সংখ্যায় অনেক অনেক বেশি ডিবিবিএল এর বুথ। একটা বুথ থেকে ডাক দিলে আরেক বুথের লোক শুনতে পাবে, প্রায় এমন দূরত্ব। আল্লায় জানে কারণ কী! রাস্তায় দেখলাম প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে শিক্ষকবৃন্দ। বাড়িভাড়া বাড়ানোর দাবিতে তাদের মানববন্ধন।

ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে বাংলাদেশের খেলা। নূপুর বাংলাদেশের পতাকা বের করে মাথায় পরে নিলো। পুরো গাড়ির ভেতরটা ভরে উঠলো এক টুকরো বাংলাদেশে। একটা করে উইকেট পড়ার খবরে ওঠে তুমুল চিতকার। বিডিআর একে তাকে ইন্সট্রাকশন দিচ্ছে কোথায় কী মেসেজ পাঠালে ক্রিকেটের আপডেট পাওয়া যাবে।

মজা করতে করতে পৌঁছে গেলাম, শিলাইদহ কুঠিবাড়ি। গাড়ি থেকে নেমেই আগে মালাই আইসক্রিম। এটা আগে খাইনি কোথাও। দারুণ লাগলো! তারপর, ঢুকে পড়লো রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়িতে নজরুল ও তার দলবল। সত্যি বলতে কী, কল্পনার তুলনায় অনেক জীর্ণ মনে হয়েছে রবিঠাকুরের বাড়িটা। মিশা টানলো আমাকে, দেখালো, গোল একটা টেবিলের দুপাশে হাতলওয়ালা দুটো চেয়ার। অথচ ক্যাপশন এঁটে দেওয়া, "হাতলবিহীন চেয়ার"। হাসলাম আমরা। এগুলো ঠিক রবিবাবুর ব্যবহার করা ফার্নিচার কিনা সন্দেহ হলো। তবে তাঁর আঁকা কিছু ছবি দেখে ভয়ানক মুগ্ধ হয়েছি। মুগ্ধ হয়েছি তাঁর কণিষ্ঠা কন্যার ছোটোবেলার ছবি দেখে। প্রতিমার মতো দেখতে ছিলো। বাবা মারা যাবার পর কবির দাড়িবিহীন ছবি ভীষণ অচেনা লেগেছে। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে তাঁর কাঠের বারান্দাটা। তালা লাগিয়ে রাখায় ফাঁকফোকর দিয়ে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। দোতলায় বড়ো বারান্দায় একটা নৌকো আছে। ওটা দোতলায় কী করে উঠলো কে জানে। আর অন্যপাশে নৌকো না, কিন্তু ওই টাইপ কিছু একটা। এটা কী? এই প্রশ্নের জবাবে সংশপ্তকের ত্বরিত উত্তর, "ওটা রবিবাবুর বাথটাব ছিলো।"

অবশেষে বেরিয়ে এলাম আমরা। আরো একবার মালাই।

সবশেষে আবারো গাড়িতে। আসার আগে আমার ধারণা ছিলো, সারারাত বসে বোধ হয় শুধু লালনের গান শোনাই হবে। মূলত ওটা ছাড়া বাকি সবকিছুই হলো। কিছুক্ষণ পর, বেলা প্রায় একটা তখন, যখন দুটি পথ দুটি দিকে, আমার জন্য একটা অটো ঠিক করে দিলেন আরিফ ভাই। ওরা একসাথে ফিরতে থাকে পুরোনো শহরে। আর আমি ফিরতে থাকি একশোরাশ ভালো লাগা নিয়ে ...

সবুজ পাহাড়ের দেশে

অনুপম ত্রিবেদি

আজ থেকে প্রায় ১২ বছর আগে, প্রথম যেদিন পাহাড়ের সামনে দাঁড়াই সেদিন অপলক তাকিয়ে থেকে বুঝেছিলাম যে, 'প্রথম দর্শনে প্রেম' কতটা গভীর হতে পারে। চারদিন চষে বেড়িয়েছি রাঙামাটির যতটুকু অংশে ঐ কয়দিনে যাওয়া যায়। তারপর এক পরিচিতের কাছ থেকে জানতে পারলাম বান্দরবানের সৌন্দর্যের কথা। সেইদিন থেকে আমার দিন গুনে গুনে সময় যায়, একদিন ঠিক ঠিক বান্দরবানের পাহাড়ের সামনে গিয়ে অবাক বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়াবো। ২০০৬-এ আমি আর আমার বউ রোয়েনা ঘুরতে গেলাম কক্সবাজার। এদিক সেদিক যাই আর হঠাৎ হঠাৎ দূর দিগন্তে পাহাড়ের রেখা দেখি। ডুলাহাজরা সাফারি পার্কের ওয়াচটাওয়ার থেকে ছবি তুলি আর আমাদের সবগুলো ছবির দিগন্ত দখল করে নেয় সারি সারি পাহাড়। আমার মন আরো উচাটন হয়! রোয়েনা জিজ্ঞেস করে *'পাহাড় অনেক সুন্দর, তাই না? আমাকে পাহাড় দেখাতে নিয়ে যাবে?'* আমি তাকে কথা দেই আর প্রহর গুনতে থাকি কবে যাবো সেই পাহাড়ের দেশে! একদিন ঠিক ঠিক আমার সে অপেক্ষা শেষ হয় আরো বছরখানেক পর!

দিনক্ষণ ঠিক মনে নেই, শুধু মনে আছে আমি হেঁড়ে গলায় সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করছিলাম আর আশেপাশের লোকেরা আমাকে পাগল ভেবে হাসছিলো। বান্দরবান শহরে পর্যটনের হোটেলে কোনো রুম পাইনি তাই মন খারাপ করে রওনা হলাম মিলনছড়ির উদ্দেশ্যে, শুনলাম সেখানে নাকি একটা রিসর্ট আছে। মিলনছড়ি জায়গাটা মূল শহর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার ভেতরে। কিন্তু ওখানে গিয়ে আমার চিৎকার আর আনন্দ শতগুণে বেড়ে গেলো, কারণ ঐ জায়গাটা শহর থেকে অনেক অনেক সুন্দর। যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ পাহাড়ের মেলা আর মেঘে-পাহাড়ের ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলা। এত রহস্যময়তা এ জীবনে আর কখনোই দেখিনি, দেখবো বলেও ভাবিনি।

এই দৃশ্য কোনো ক্যামেরায় বন্দি করা সম্ভব নয়, শুধু দেখে দেখে উপলব্ধি করতে হয় মনে - এই দেশ, এই প্রকৃতি আমার! আশেপাশে বেশ ঘুরাঘুরি করে সন্ধ্যায় ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা ভাইয়া, সাঙ্গু নদীটা এখান থেকে কতদূর?' উনি একগাল হেসে বললেন যে, 'ওটা তো অনেক দূরে হবে এখান থেকে, সকাল বেলা রাস্তা দেখিয়ে দেবো।' সকাল বেলা উঠে সবিস্তারে সব জানার পর 'পুরাই তাব্দা খাইলাম' অবস্থা। কারণ, মিলনছড়ি রিসর্ট থেকে একটু

উঁকি দিলেই দেখা যায় পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলে গেছে যেই ছোট্ট একটা নদী, ওটাই সাঙ্গু।

সাঙ্গুতে যাওয়ার মূলত দুইটা পথ- স্কুটারে করে পুরাতন ব্রিজ নৌকা ঘাটে নামতে হবে অথবা মিলনছড়ি রিসর্টের কিছুটা সামনে পাহাড় বেয়ে লোকালয় হয়ে যাওয়া। প্রথমটা পানির মতো সোজা, কিন্তু পরের পদ্ধতিটা বেশ শ্রমসাধ্য আর অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। আমি আর রোয়েনা অনেক ভেবে দ্বিতীয় পথটা বেছে রওনা দিলাম। বহু কষ্টে পাহাড় বেয়ে বেয়ে নামার পর সাঙ্গুর যেই ভিউটা দেখলাম তাতে ঐ দিনে দ্বিতীয়বারের মতো 'পুরাই তাব্দা' খাইলাম। নৌকা নিয়ে প্রায় তিনঘন্টা

দুজনে ঘুরে বেড়ালাম সাঙ্গু, ফিরলাম প্রথম রাস্তা দিয়ে অর্থাৎ পুরাতন ব্রিজ নৌকাঘাটে নেমে। এবং বিকেলে আবারও পাহাড় বেয়ে সাঙ্গু গেলাম, দেখা তো আর ফুরায় না।

তার মধ্যে একদিন লোভ জাগলো পাহাড়ি মানুষগুলোর জীবনযাত্রাটা একটু দেখে আসি। সেই ভেবে গেলাম মিলনছড়ির খুব কাছেই ফারুকপাড়া নামের একটা যায়গায়। ওখানে ঢুকার প্রথমেই চোখে পড়লো একটা গির্জা, মোটামুটি নতুন। বুঝলাম বৌদ্ধের পাশাপাশি এই অঞ্চলে যিশুও মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছেন। সেখানে গিয়ে তাদের একটা পিকনিকের বন্দোবস্ত করতে দেখলাম ছেলেবুড়ো সবাইকে মিলে। নানান বাহারি রঙের জামা কাপড়ে বাচ্চারা ছুটোছুটি করছে এদিক ওদিক। দুজনের হাতে ক্যামেরা দেখে কেউ দিলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট আবার কেউ টুক করে পোজ দিয়ে বললো- ছবি তোলেন। মানুষের এই জীবনধারার ছবির কিছুই আমি বুঝি না, ওটা রোয়েনার সাবজেক্ট, কিন্তু তবুও আমি না তুলে পারলাম না। আনন্দগুলো বোধহয় এভাবেই ধর্ম-বর্ণ-জাতিগত বিভেদ ভুলে মানুষ থেকে মানুষে বাধাহীন উচ্ছ্বাসের রূপলাভ করে।

চলে আসার সময় সবাই নিমন্ত্রণ জানালো সন্ধ্যায় যেন ওদের সাথে এসে একসাথে খেয়ে দেয়ে আনন্দ করি। আমরা শহুরে কংক্রিটে তৈরি মানুষ, এইসব মাটির মায়ায় মেশা মানুষগুলোর আতিথেয়তায় বিস্মিত হই শুধু।

বিকেলের পড়ন্ত বেলায় গেলাম স্বর্ণ মন্দিরে, একদম সোজাসাপ্টা কোনো অ্যাডভেঞ্চারে না গিয়ে স্কুটারে করে। প্রথমেই গিয়ে পড়লাম এক ভুল জায়গায় তারপরও টুকটাক ঘুরতে লাগলাম। বাসাব নামের এক ভিক্ষুর সাথে পরিচয় হলো, তার সাথেই ঘুরে বেড়ালাম ঐ মন্দির। আসার সময় ফোন নাম্বার রেখে দিলো, এখনও যোগাযোগ করে ছেলেটি। ওখান থেকে বেরিয়ে আর ভুল নয়, বাসাবের দেখানো রাস্তায় রিকশা করে দৌড়। আসল স্বর্ণ মন্দিরে এসে প্রাণ জুড়ালো।

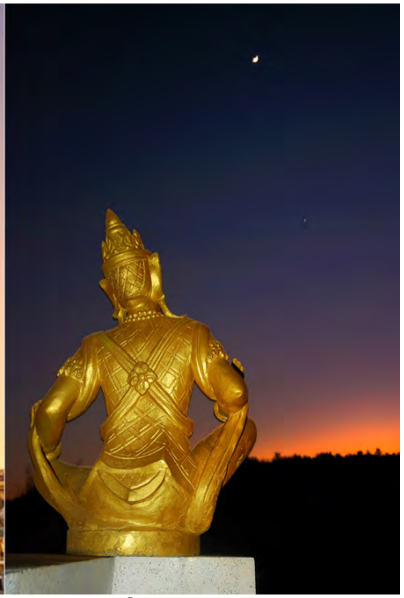

ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে এক ভিক্ষু এসে বললো তারও অনেক ফটোগ্রাফির শখ। কথায় কথায় নাম জানতে পারলাম- ধার্মিকা। সেই সব ঘুরিয়ে দেখালো আর সন্ধ্যায় তার রুমে চা-নাশতার সাথে তাকে ফটোশপের কিছু টেকনিক শেখাতে হলো। বুঝলাম, ঢেঁকি হয়ে জন্মালে শুধু স্বর্গে নয়, বান্দরবানেও ধান ভানতে হয়।

তারপর দিন যায় আর আমি ফিরে ফিরে যাই বান্দরবান। এভাবে ছয়টি ঋতুতেই আমার দেখা হলো সাঙ্গুর সাথে, দেখা হলো দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়সারির সাথে, দেখা হলো নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো সাদা সাদা মেঘের সাথে আর কতগুলো সদাহাস্য সরল মনের পাহাড়ি মানুষের সাথে। তারপরও মনে হয় দেখা হয়নি কিছুই, আরো অনেক দেখার বাকি। হয়তো দেখতে দেখতে একদিন মনে হবে চোখ দুটো এখানেই রেখে যাই, যেন একটা পলকের জন্যও এই মোহময়তাকে মিস না করি।

এই দেশটাতে ক্ষুধা আছে, দারিদ্রতা আছে, ঝড়, বন্যা, ক্ষরা লেগে আছে, তারপরও প্রকৃতির যে অপার ভালোবাসা আছে সেই টানেই গর্ব করে বলতে পারি ***‘সকল দেশের রানি, সে যে আমার জন্মভূমি।’***

একটা দিন, মুন্সিগঞ্জে

ওডিন

সবাই ভেবে থাকে যে আমি নাকি সুযোগ পেলেই হিমালয়ের আনাচেকানাচে গিয়ে বসে থাকি, প্রায় ধসে পড়া তিব্বতি মঠে নুন- মাখন দেওয়া চা খেতে খেতে শতবর্ষী লামাদের সাথে মোক্ষ লাভের সবচে' মোক্ষম উপায় নিয়ে আলাপ করি। কথাটা পুরোপুরি ঠিক না। দেশের বাইরে যাওয়া হয় যখন অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক এবং পেশাগত ফ্যাকটরগুলো একসাথে মিলেমিশে একটা মোক্ষম সুযোগ সৃষ্টি করে, নাহলে দেশের মধ্যেই ঘুরে বেড়াই। পার্বত্য চট্টগ্রাম আর সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চল ছাড়া সব প্রায় জায়গাতেই যাওয়া হয়েছে, এমনকি গাইবান্ধা, ছাগলনাইয়া, ভেড়ামারার মতো বিখ্যাত 'টোটেম-টাইটেলড' জায়গাগুলোও আমার পদস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি। তবে গত একটা বছরে নতুন কাজ আর পড়ালেখার জন্য একটু প্যাঁচের মধ্যে পড়ে গেছি, তাই দেশের মধ্যে ঘোরাঘুরিটাও একটু কমে গেছে।

তারপরেও পায়ের নিচের শর্ষের অবস্থানের সাথে রক্তের শিরায় নাচন ওঠার মনে হয় একটা আপেক্ষিক সম্পর্ক আছে, তাই ক্যালেন্ডারে ছুটির দিনগুলো আসি আসি করতে থাকে, তখনই কেমন জানি লাগতে থাকে। একটা সময় ভাবতাম এইটা মনে হয় শুধু আমারই সমস্যা, কিন্তু পরে দেখি আমার মতো আরো অনেকেরই এইরকম হয়। আমি সবসময়ই বলি জীবনে অসমোসিস- এর একটা বড়ো ভূমিকা আছে, সব পাপী লোকজন কীভাবে কীভাবে জানি এক জায়গাতেই এসে জোটে। আর এই পাপী লোকজনের সবাই একসাথে ছুটির কোনোরকম লক্ষণ দেখলেই নড়াচড়া শুরু করে।

তো, গত ডিসেম্বরে যখন ক্যালেন্ডারে দেখা গেলো যে ষোল তারিখটা হচ্ছে 'বৃহস্পতিবার', আমাদের পুরোনো পাপী সংঘের সভ্যদের এমন নড়াচড়া শুরু হলো যেইটাকে কেবলমাত্র বড়োসড় সিজমিক অ্যাক্টিভিটির সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। আমরা বিশাল বিশাল সব প্ল্যান প্রোগ্রাম শুরু করে দিলাম যে এই দুইদিন কোথায় যাওয়া যেতে পারে। কেউ বলে কুয়াকাটা, কেউ বলে জয়পুরহাট- সাদা পাথর দেখতে, কেউ বলে সিলেটের ভোলাগঞ্জের পাথর দেখে আসি, কেউ আরো এককাঠি সরেস- বলে "শিলঙ যামু!" (এইটা বলেছিলেন- ইওর'স ট্রুলি)।

কিন্তু যত গর্জে তত বর্ষে না, এই আপ্তবাক্যকে সত্য প্রমাণ করেই বুধবার রাত পর্যন্ত আমরা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। শেষমেষ এইটুকুতে একমত হওয়া গেলো যে, আমরা সকাল সাতটার সময় শাহবাগে বিএসএমএমইউ- এর সামনে একজোট হচ্ছি। ছুটির দিনের সকালের ঘুমের কাঁথা পুড়িয়ে, নগরের দূরদূরান্ত থেকে কাকডাকা ভোরে আমরা এসে হাজির হলাম। কেউ এলো পুরোনো ঢাকা থেকে, কেউ সিদ্ধেশ্বরী আর কেউ সুদূর উত্তরা- কিন্তু ওইখানে আসার পরে আমাদের সংঘের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধটা আরো স্পষ্ট হলো। আমরা ছয়জন ছয়দিকে যেতে চাচ্ছি। কেউ মানিকগঞ্জের বালিয়াটি জমিদারবাড়ি দেখতে (এইখানে আগে যাওয়া হয়েছে বলে তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হলো), কেউ পাটুরিয়া ফেরিঘাট ক্রস করে পদ্মার ওপারে হাঁটাহাটি করতে চাচ্ছে, কেউ চাচ্ছে ঢাকা টু ময়মনসিংহ 'এ জার্নি বাই ট্রেইন' করতে। একথা শুনে আরেকজন বলে জার্নি বাই বোটের কথা- সদরঘাট থেকে আশুলিয়া। সব শুনেটুনে একজন বলে ' "আজ আমি কোথাও যাবো না", সবাই উত্তরায় আমার বাসায় চলো- ওইখানে সারাদিন আড্ডা আর খাওয়াদাওয়া হবে, দিনশেষে এয়ারপোর্টের পেছনে গোধূলিলগ্নে বিমান- উড্ডয়ন দেখতে যাওয়া যেতে পারে।' এই আইডিয়াতে আমরা সবাই সজোরে ভেটো দিলাম- কারণ প্রস্তাব উত্থাপনকারী যা বলেন নাই তা হলো, আড্ডা আর খাওয়াদাওয়ার সাথে তাঁর স্বরচিত, নিজের সুরারোপিত, নিজের গলায় গাওয়া গান শোনার একটা ব্যাপার থাকতে পারে- আর যেইটার জন্য আমরা কেউই শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত নই।

নানান তর্কবিতর্কের পরে আমরা আমাদের আপাতত প্রাথমিক লক্ষ্য ঠিক করলাম- বংশালের আল রাজ্জাক রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্ট। তারপরে ভরা পেটে ঠাণ্ডা মাথায় সবাই মিলে একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে বাসে করে গুলিস্তানের পথে যেতে যেতেই একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলো, আমরা মুন্সিগঞ্জ যাচ্ছি। লক্ষ্য- বিখ্যাত ইদ্রাকপুর কেল্লাদর্শন। যদিও আমাদের কোনো ঠিকঠাক ধারণা নেই জায়গাটা মুন্সিগঞ্জের ঠিক কোথায়; আমরা শুধু জানি যে এইটা ইছামতির তীরে, লালবাগ কেল্লার সমসাময়িক, আর মীর জুমলা বানিয়েছিলেন; কিন্তু একবার মুন্সিগঞ্জ গেলে জায়গাটা ঠিক খুঁজে বের করে ফেলা যাবে।

খাওয়াদাওয়া করে, ঠাণ্ডা মাথায় নিজেদের প্রায় ভেঙে পড়া ভ্রাতৃত্ববোধ আবার ঝালাই করে নিয়ে আমরা নয়াবাজার ব্রিজের কাছে এলাম মুন্সিগঞ্জের বাস ধরার জন্য। এইখানে এসে একটা ভালো ঝামেলায় পড়া গেলো। লং উইকেন্ডের সুযোগ নিয়ে অনেকেই ঢাকা ছাড়ছে, তাই সবগুলো বাসেই ঠাসাঠাসি অবস্থা। সরাসরি মুন্সিগঞ্জের বাস আমরা ধরতে পারলাম না, বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে টঙ্গীবাড়িগামী একটা বাসে আমরা দুইদলে ভাগ হয়ে কোনোমতে উঠতে পারলাম। একদল চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে ভেতরে দাঁড়ানোর জায়গাটুকু করে নিতে পারলো, আরেকদল হৈ হৈ করতে করতে বাসের ছাদে উঠে এমন ভাব করতে লাগলো যেন তারা মূসা ইব্রাহীমের ‘কালাতো’ ভাই! তবে ওদের দাঁত কেলানো একটু পরেই বন্ধ হয়ে গেছিলো- ’কালা’ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছিলো, যখন বাস কেরানীগঞ্জ ছাড়িয়েই দুইপাশে বড়োবড়ো গাছওয়ালা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো।

বুড়িগঙ্গা ব্রিজ আর এর আশেপাশের জ্যাম ঠেলে বের হতে হতেই প্রায় ঘণ্টাদেড়েক লেগে গেলো। এরপরেই খোলা মহাসড়ক আর দূরন্ত বাতাস। যদিও রাস্তার দুইপাশের গাছের কারণে আমার ছাদের বন্ধুদের সামান্য অসুবিধা হচ্ছিলো, তারপরেও পুরো ব্যাপারটাই ছিলো চমৎকার। ঘন্টা দুয়েকের মাঝেই আমরা টঙ্গীবাড়িতে। বাসস্ট্যান্ডের পাশে একটা রেস্টুরেন্টে ‘সেকেন্ড ব্রেকফাস্ট’ করে আশেপাশের বাজারটা একটু ঘুরে দেখা হলো। সংঘের কেউ কেউ গামছা কিনলেন- এইখানের গামছা নাকি বিখ্যাত। সংঘের আরেকজন কলার খোসায় আছাড় খেয়ে বাকি সদস্যদের চিত্তবিনোদনের কারণ হলেন। তারপরে বাসের জন্য আর অপেক্ষা না করে একটা ইলেকট্রিক অটোরিকশা ভাড়া করে ফেলা হলো- যেইটাকে দেখলাম কথ্য ভাষায় বলা হচ্ছে ‘ব্যাটারি’! মনে হয় নামটা সিএনজি অটোরিকশার সংক্ষেপিত রূপ যেমন ‘সিএনজি’, সেইরকম মনে হয়। এমনিতে জিনিসটা আমাদের সবারই খুব পছন্দ হলো, ইঞ্জিনের শব্দটা তেমন একটা নেই বলেই হয়তো- আর বেশ খোলামেলা।

মুন্সিগঞ্জ শহরে ঢোকার আগে মুক্তারপুর ব্রিজ, যেইটা নতুন করা হয়েছে, সেই পথে না গিয়ে আমরা নদীর ধারের পুরোনো রাস্তাটা ধরলাম। একবার থেমে নদীর পাশে বালির মধ্যে গিয়ে কিছুক্ষণ ফটোগ্রাফির চেষ্টা করা হলো।

এরপর আর খানিকক্ষণের মাঝেই আমরা বেশ ছিমছাম আর নিরিবিলি মুন্সিগঞ্জ শহরে পৌঁছে গেলাম। আরেকদফা খাওয়াদাওয়ার পরে ইদ্রাকপুর কেল্লা খুঁজে বের করার কাজ শুরু হলো। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতেই জানা গেলো

লোকেশনটা, শিল্পকলা অ্যাকাডেমির পাশের রাস্তা ধরে যেতে হবে। আমরা হেঁটে হেঁটেই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কেল্লার দেওয়ালের কাছে পৌঁছে গেলাম।

ইদ্রাকপুর কেল্লার মূল প্রাচীরের বাইরে আরেকটা বাউন্ডারি ওয়ালের মতন আছে- এর দরজায় আবার তালা দেওয়া ছিলো, একজন গেলো কেয়ারটেকার বা দারোয়ানকে খুঁজে বের করতে, আর আমরা চারপাশে ঘুরে দেখলাম।

বাইরের সাইনবোর্ড দেখে যা জানা গেলো, এইটা মুঘল সুবাদার মীর জুমলা তৈরি করেছিলেন ১৬৬০ এর দিকে, মগ আর পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাত থেকে ঢাকার জলপথ রক্ষা করার জন্য। কেল্লার স্থাপত্যের সাথেও লালবাগের কেল্লার

অনেক মিল আছে। তবে আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেইটা সেখানে লেখা দেখলাম, আর আমরা আগেও শুনেছিলাম, যে ইদ্রাকপুরের কেল্লার সাথে নাকি লালবাগের কেল্লার সুড়ঙ্গপথে যোগাযোগ ছিলো। আমরা ঠিক করে ফেললাম ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে। এর মধ্যে কেয়ারটেকারের খোঁজ পাওয়া গেলো, সে এসে তালা খুলে দিলে আমরা কেল্লার মূল কমপ্লেক্সের ভেতরে ঢুকলাম।

আসলে দুর্গের পাশের দেওয়াল ছাড়া ভেতরে আর কিছু অবশিষ্ট নেই, কোন এক ভূমিকম্পে নাকি ভেতরের দালান সব ধসে পড়েছে। মাঝখানে বেশ উঁচু একটা মাটির ঢিবি, যেইটা মনে হয় সেই ধসে পড়া দালান হবে, তার ওপরে একটা বাংলো টাইপের দালান, সেইটারো বেশ জীর্ণ অবস্থা। এইটা নাকি ব্রিটিশদের সময়ে বানানো হয়েছিলো, পাকিস্তানের শেষ সময় পর্যন্তও সরকারি অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন এইটারও ছাদ ধসে পড়ছে। ভেতরে

দেখলাম স্থানীয় কাঠমিস্ত্রিরা অক্ষত কয়েকটা ঘরকে ফার্নিচারের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করছে। একটা অত্যন্ত ছায়াচ্ছন্ন কক্ষে সংঘের এক মহাপাপিষ্ঠ সভ্যকে ভুলিয়েভালিয়ে এনে একটু ভূতের ভয় দেখানো হলো। তারপর কিছু সময় এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে আমরা সেই সুড়ঙ্গ খোঁজার কাজে নিয়োজিত হলাম, আর একটু আগের প্র্যাকটিকাল জোকের ভিকটিম আমাদের গুমখুন হয়ে যাবার প্রার্থনা করতে লাগলো। কারণ, আরো নাকি কথিত আছে যে অনেকেই নাকি এই সুড়ঙ্গ খুঁজতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। এই কারণেই মনে হয় দুর্গের অক্ষত সব প্যাসেজ আর করিডোরগুলো দেওয়াল তুলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা একটু আশাহত হয়েই বের হয়ে এলাম।

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম পাশেই নাকি ‘বাবা আদম শাহী মসজিদ’ নামে একটা বেশ পুরোনো মসজিদ আছে, তেরো শতকের। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে

সেইটা দেখে আসা হলো। ইমাম সাহেব বড়োই চমৎকার লোক, আমাদের সাথে অনেকক্ষণ গল্প করলেন।

হাঁটতে হাঁটতে আবার শহরের মূল অংশে ফেরত এসে আমাদের পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ছকে ফেলা হলো। খাওয়াদাওয়ার পর (হ্যাঁ! আবারো, তবে এইবার লাঞ্চ।) আমরা অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান বজ্রযোগিনী গ্রাম দেখতে যাবো। গত অকটোবরে ভূটান গিয়ে অতীশ দীপঙ্করের দেশের লোক বলে একটু হলেও এক্সট্রা খাতির পেয়েছিলাম, তাই এইখানে যাওয়াটা ছিলো অবশ্যকর্তব্য। ইন্টারেস্টিংলি, স্থানীয় লোকজনের কাছে অতীশ দীপঙ্করের বাড়িটা ‘নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা’ বলে পরিচিত। আরেকটা ‘ব্যাটারি’ তে চড়ে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই বজ্রযোগিনী গ্রামে চলে এলাম। অতীশ দীপঙ্করের বাড়ির তো আর কিছু অবশিষ্ট নেই, তবে তার জন্মস্থান বলে একটা জায়গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, আর সেইখানে একটা প্যাগোডার মতন করা হয়েছে চীন সরকারের আনুকূল্যে।

এর একটু দূরেই মাঠের মাঝখানে দারুণ একটা লাইব্রেরি আর অডিটোরিয়াম করা হয়েছে, মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। বন্ধ ছিলো বলে আমরা ভেতরে ঢুকতে পারি নাই অবশ্য।

দিন প্রায় শেষের দিকে, এখন ফেরার সময়। আমরা ঠিক করে ফেললাম বাসে না, আমরা নদীপথে ফিরবো, লঞ্চে বা ট্রলারে করে। আবারো আরেকটা ‘ব্যাটারি’ আর এরপর রিকশা নিয়ে চলে গেলাম মিরকাদিম লঞ্চ টার্মিনালে। দক্ষিণবঙ্গ থেকে লোকাল স্টিমার আর ছোটো লঞ্চ এইদিক দিয়েই আসবে। টার্মিনালে বসে আমরা নদী দেখতে লাগলাম, এর মাঝে মাঝে আমাদের সংঘের সেই মহাপাপিষ্ঠ সভ্যকে পানিতে ফেলে দেওয়ার অপচেষ্টা, আর থেকে থেকে চিনাবাদাম, চানাচুর, কমলা, ঝালমুড়ি এইসব হাবিজাবি খাওয়া চলতে লাগলো।

পাঁচটার দিকে আমরা পটুয়াখালি থেকে আসা একটা লঞ্চ ধরতে পারলাম। তারপর টিকেট কেটে সোজা ডেকে! ওখানে গিয়েও একদফা ধাক্কাধাক্কি চললো, সেই পাপিষ্ঠকে সলিলসমাধি দেবার আশায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সফল

হলাম না। এর মধ্যে ঠাণ্ডাও বেশ বেড়ে গিয়েছিলো- যার যা এক্সট্রা কাপড় ছিলো সব কানে মাথায় পেঁচিয়ে আমরা বসে বসে সন্ধ্যার নেমে আসা দেখলাম। এর মাঝে আবার একজন চানাচুরওয়ালাকে খুঁজে বের করা হয়েছে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে আমরা একটু বেশিই উদাস হয়ে পড়েছিলাম মনে হয় - তাই চানাচুর খাওয়া শেষে দেখা গেলো আমরা একেকজন মনে হয় কেজিখানেক চানাচুর খেয়ে ফেলেছি!

লঞ্চ বাদামতলি ঘাটে এসে পৌঁছলো সন্ধ্যার একটু পরে। লঞ্চ থেকে নেমে দেখি আমাদের একজনকে আবার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করা হলো টিকেট চেকারের কাছ থেকে- সে একটু পাকনামি করে আগেভাগে নামতে গিয়ে ধরা পড়েছে- আর ওর টিকেট ছিলো আমাদের কাছে। এইসব ঝামেলার কিছুক্ষণ পর আমরা নিজেদের আবিষ্কার করলাম চকবাজারের নূরানী কোল্ড ড্রিঙ্কসে, হাতে লাচ্ছির গেলাস আর ব্যাকগ্রাউন্ডে আখতারি বেগমের গজলের মাঝখানে। গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সবাই আর কিছু না হোক, একটা বিষয়ে একমত হলাম- আজকের দারুণ দিনটার দারুণ ঘোরাঘুরির সবকিছু এত দারুণ আর দুর্ধর্ষ হওয়ার আসল কারণ- এইটা ছিলো একেবারে অপরিকল্পিত একটা ভ্রমণ! আমরা ঠিক করে ফেললাম- এরপর থেকে সব ঘোরাঘুরিই করতে হবে এইরকমভাবে, কোনোরকম পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই। দুই দিনের দুনিয়াই তো! কী আর আছে জীবনে?

ভ্রমণ- খিচুড়ি: আমেরিকার সেরা তিন

তাসনীম

'ভ্রমণকাহিনি লিখতে হবে- সচলের ই-বুকের জন্য। হাতে আছে মাত্র তিনদিন। এর মধ্যে ভ্রমণ সেরে এসে কাহিনি লেখা যাবে বলে মনে হয় না। যদিও সামনে অনেকগুলো ভ্রমণের পরিকল্পনা আছে। কবিটবি হতে পারলে বেশ ভালো হতো, ওনাদের ভ্রমণ বেশ সহজ। আবুল হাসান বলেছেন- এ ভ্রমণ আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া। অর্থাৎ ডেটিং মারলেই ওনাদের ঘোরাঘুরি শেষ। বর্তমান জীবনের বাস্তবতায় কারও সাথে ডেটিং মারার সময়ও নেই। সময় পেলে একটু আড্ডা মারতাম আগে।

তাহলে কী করবো? একটাই উপায়, পুরোনো কোনো ভ্রমণের গল্প নতুন মোড়কে ভরে বেচে দেওয়া। নজরুল ভাই শব্দসীমা দিয়েছেন ১৫০০- সর্বনাশ! আমি মঙ্গলগ্রহে গেলেও ২০০ শব্দের ভেতর সবকিছু বর্ণনা করে দেবো। সেই সঙ্গে ছবি, কীভাবে যেতে হয়, কী খাবেন এই জাতীয় তথ্যও দেওয়া দরকার। যাই হোক শুরু করি।

আপনি যদি আমেরিকাতে বেড়াতে আসেন তাহলে আমার এই পরামর্শগুলো নিতে পারেন। না নিলেও বেশি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না যদিও। একটু গল্প আর কয়েকটা ছবি দিয়ে তৈরি করলাম আজকের ভ্রমণ- খিচুড়ি।

আল- কাতারিয়া:

কাতার কি আমেরিকাতে নাকি? ওটা তো জাপানের কাছে. . . (সৌজন্যে মতিকণ্ঠ ট্রাভেল ডেস্ক) ।

ভালো একটা বুদ্ধি দেই। আমেরিকাতে যদি এমিরেটস বা কাতার এয়ারলাইনসে আসেন তবে চেষ্টা করুন যেকোনো একটা দেশে ট্র্যানজিট ফেলার। অন্য দেশ আমাদের দেশ দিয়ে ট্র্যানজিট সুবিধা চাইলে অনেক হৈ- চৈ হয় দেখেছি কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে ট্র্যানজিটে বিশ্বাসী। কাতার এয়ারলাইনসের কানেকশন খুব জোরালো নয় শুনেছি, ধানাইপানাই করে একটা দিন থেকে যাওয়া সম্ভব বলেই মনে হয়। আমি নিজেও বাংলাদেশ থেকে মার্কিন দেশে আসার পথে ১৮ ঘন্টা থেকেছি। ওরাই হোটেল দেবে, ওরাই খাবারের কুপন দেবে। আপনার কাজ হচ্ছে শুধু আরব্য রজনীটা উপভোগ করা।

দোহা এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমেই ইমিগ্রেশনে প্রচুর মহিলা অফিসার পাবেন। সবাই হিজাব পরিহিতা। ওনাদের সাথে ভাব- ভালোবাসা বিনিময় করার বেশি সুযোগ নেই। ওনারা হাতে ইশারায় ডাকবেন আর বলবেন "কাম"। আপনি এগিয়ে যাবেন, হাতের পাসপোর্টটা নিয়ে দড়াম করে একটা সিল আর "গো"।

সাধারণত এয়ারলাইনসের হোটেলগুলো দারুণ হয়। বাফেতে প্রচুর খাবার, সবই সুস্বাদু। বাফের বাইরে একটা তাঁবুতে হুক্কা খাবার সুবন্দোবস্ত। আরবরা প্রচুর হুক্কা খায় দেখি। ভরপেট খাবার শেষে বাইরে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরবেন। ঘন্টাচুক্তি, দুই ঘন্টার জন্য প্রায় চল্লিশ ডলার। ট্যাক্সিচালক ভারতীয় বা বাংলাদেশী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার মতো ওরাও চুক্তিতে বিশ্বাসী।

দোহাতে দর্শনীয় কী আছে? অনেককিছুই, পুরোনো শহরের বাসা- ঘর ভেঙে কাতারিরা গড়ে তুলছে সুরম্য অট্টালিকা। একটু গেলেই আরব্য উপসাগর, আরব ছোকররা জেট স্কি করছে সেখানে। BMW-এর শোরুমের নাম দেখলাম- Affordable Auto। শুনেছি কাতার নাকি পরবর্তী দুবাই হতে চলেছে। ছবি জুড়লাম গোটা কয়েক। দোহাতে আছে মিউজিয়াম অব ইসলামিক আর্ট। এটা দেখার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু ওইদিন ওটা কী কারণে যেন বন্ধ ছিলো। এয়ারলাইনগুলো যেখানে হোটেল দেয় তার থেকে একদম হাঁটা দূরত্বেই এই মিউজিয়ামটা।

নিউইয়র্ক- নিউইয়র্ক:

এই শহরটা এবং এই রাজ্যের ব্যাপারে আমার পক্ষপাতিত্ব আছে, ঠিক যেমনটা আছে জাফর ইকবাল স্যারের প্রফেসর ইউনূসকে নিয়ে। আমি মার্কিনদেশের বিভিন্ন রাজ্যের সৌন্দর্যের বিচার করতে হলে সবার প্রথমে নিউইয়র্ক রাজ্যকে(শহরটা নয়) রাখতাম। দ্বিতীয় স্থান দিতাম কলোরাডো, আর থার্ড প্লেইস পেত অরিগন রাজ্য। অনেকের পছন্দের রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়াকে আমি টপ থ্রিতে স্থান দিতে নারাজ, একটু ওভাররেটেড মনে হয় এই রাজ্যের সব দর্শনীয় স্থান।

নিউইয়র্কে কোথায় থাকবেন? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ। আপনি নিশ্চিতভাবে এই শহরের কাউকে চেনেন। আমাদের সবারই মনে হয় কেউ না কেউ থাকে নিউইয়র্কে। তাদের বাসায় এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে ওঠাটা মোটেই খারাপ কাজ নয়। প্রবাসী বাংলাদেশিরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ হন। নিউইয়র্ক শহরের দর্শনীয় স্থানের এক নম্বরে সবারই থাকবে স্ট্যাচু অব লিবার্টি, দুই নম্বরে আছে টাইম স্কোয়ার যদিও জায়গাটা দুই নম্বর নয় মোটেই। সেন্ট্রাল পার্কটাও মিস দিবেন না।

নিউইয়র্ক শহরে বাংলাদেশী খাবার পেতে কোনো অসুবিধা নেই। আমার এক সহকর্মী ছিলেন যাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা জ্যাকসন হাইটসে। তাঁর মা এখনো থাকেন সেখানে এবং প্রায়ই বাংলাদেশী রেস্তোরাঁতে গিয়ে ভাত- ডাল খান উনি। সুতরাং বাংলাদেশ মিস করার কোনো সুযোগই নেই। বাংলাদেশী দোকানপাটের সমারোহ দেখার জন্য হলেও জ্যাকসন হাইটসে যাওয়া উচিত।

নিউইয়র্ক থেকে বাসে বা ট্রেনে করে নায়াগ্রাতে (কাছে শহর বাফেলো) গেলে এই স্টেটটার সৌন্দর্যটা বুঝতে পারবেন। নিউইয়র্ক শহরটা পুরো রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপের মতো, মাঝেমাঝে মনে হয় এই শহরটা যেন এই দেশের ভেতর অন্য একটা দেশ। আপস্টেট নিউইয়র্কের মতো সুন্দর জায়গা খুব কমই আছে। চাকরিসূত্রে অনেকবার গিয়েছি এইসব জায়গায়, বাসে করে নায়াগ্রাতে

গেলে এর অনেকখানিই দেখা হয়ে যাবে আপনার। গোটাকয়েক ছবি জুড়ে দিলাম।

রকি মাউন্টেন হাই:

কলোরাডো রাজ্যটা মার্কিন দেশের পেটের মাঝে একদম। নিউইয়র্ক থেকে প্লেনে লাগবে প্রায় চার ঘন্টা। বাসে আসতে অন্তত দুই দিন লাগবে। দূরত্ব কমপক্ষে ১৭০০ মাইল। আমি একবার বাসে করে মার্কিন মুল্লুকের একমাথা থেকে অন্য মাথায় পাড়ি দিয়েছিলাম। আমার জীবনের স্মরণীয় সেই যাত্রাতে সাথে আর কেউ ছিল না। বকরবকর না করে তিনদিন ধরে দেশটা বিশালত্ব আর সৌন্দর্য উপভোগ করেছি। যদি সময় থাকে তাহলে এই রকম একটা ট্রিপ নিয়ে চলে আসবেন কলোরাডো স্প্রিংস।

সময়ভেদে হোটেলের দাম হবে ৭০-১০০ ডলারের মতো। একটু আগে পরিকল্পনা করলে ৭০ ডলারের আশেপাশেই হোটেল পাবেন। প্রচুর ট্যুর কোম্পানি পাবেন যারা আপনাকে গার্ডেন অব দ্য গডস, সেভেন ফলস ইত্যাদি জায়গায় নিয়ে যাবে। ঈশ্বরের বাগানে দেখবেন প্রচুর বিশালদর্শন ছাগল চরছে, ছাগুদের সবচেয়ে বড়ো সহায় তো উনিই। তবে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ জায়গা হচ্ছে পাইক'স পিক, ১৪০০০ ফুট উচ্চতায়। শহর থেকে ট্রেনে করে উঠতে ঘন্টাতিনেক লাগবে। এর সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। তবে বাতাসে অক্সিজেনের স্বল্পতাটা নিশ্চিত অনুভব করবেন। পাহাড়ে ওঠা সহজ কর্ম নয়।

কলোরাডো স্প্রিংস শহর থেকে দুই ঘন্টা দূরে পাবেন ১১০০ ফুট গভীর গিরিখাদ, দ্য রয়াল গর্জ। ছবিগুলো জুড়ে দিলাম। কলোরাডোতে কী খাবেন? হাতের কাছে যা-ই পাবেন, সেটাই গলধঃকরণ করাটাই ভ্রমণকারী হওয়ার প্রথম শিক্ষা।

পাহাড় নদী সমুদ্র

অরিগন রাজ্যে এই তিনের সম্মেলন পাবেন, একদম হাতের কাছেই। কলোরাডো থেকে কোনাকুনি উত্তর- পশ্চিমে উঠতে হবে। বাসে বা গাড়িতে গেলে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে পারবেন। মাঝে পড়বে ওয়াইওমিং, যেখানে আছে বিশ্বখ্যাত ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক। এইসব রাস্তায় ঘুরলে আপনার মনে হতে পারে আমেরিকার পুরোটাই মনে হয় জঙ্গল।

অরিগনের পোর্টল্যান্ড শহরে ডেরা ফেললে সব কিছুই হাতের কাছে। ৬৫ মাইল পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ক্যানন বিচ। দেড়শ মাইল দূরে ওয়াশিংটন রাজ্যে জীবন্ত আগ্নেরগিরি মাউন্ট সেইন্ট হেলেন। আরো কিছু দূর গেলেই মাউন্ট রেনিয়ার। এছাড়াও পোর্টল্যান্ডের পাশেই পাবেন মার্কিন স্ট্যান্ডার্ডে বিশাল একটা নদী যার আশেপাশে আছে আরও অনেক দর্শনীয় স্থান। ক্যালিফোর্নিয়ার ঠিক উত্তরে অবস্থিত এই রাজ্যে আপনি ক্যালিফোর্নিয়ার অনেক প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সন্ধান পাবেন কিন্তু অনেক কম খরচে আহার ও নিবাসের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। ছবি জুড়লাম কিছু।

মার্কিন দেশে অনেক কিছুই দেখার আছে। পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য, লেক- মোটামুটি সারা পৃথিবীর বৈচিত্র্যই ধারণ করে এই দেশ। সম্ভবত এই কারণেই এই দেশের মানুষ পৃথিবীর অন্য জায়গা সম্বন্ধে বেশি ওয়াকিবহাল নয়। আমার মতে এই তিন রাজ্য ঘুরে দেখলে মার্কিন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনেকাংশই দেখা হয়ে যায়।

আপনি আশাহত হবেন না, এই বিশ্বাস আছে।

আদিম অরণ্যের কাছাকাছি

রোমেল চৌধুরী

১

উগান্ডার এন্টেবি বিমানবন্দর থেকে লেক ভিক্টোরিয়ার বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর দিয়ে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে এলো ছোট্ট আন্তনভ বিমানটি। কঙ্গোর মাটিতে প্রথম পা রাখলাম। আমার কর্মস্থল ইতুরি জেলার বুনিয়া শহরে। শহর বলতে তেমন আর আছেই বা কী! চল্টা ওঠা রানওয়ে সম্বল করে জীর্ণদশার একটি এয়ারপোর্ট। বুড়ো দাঁড়াস সাপের মতো প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা। একটি কি দুটি পুরোনো বেলজিয়ান ধাঁচের বাংলো। আর রিলিফের নতুন টিনে ছাওয়া অসংখ্য ছাপরার বস্তি। কয়লার বাজার, পুরোনো কাপড়ের হাট, কলা- আম- এভকার্ডের পসরা সাজিয়ে বসা মেয়েমানুষ, চায়নিজ মালে সয়লাব ফুটপাথ, ভ্রাম্যমান চটপটির দোকানের মতো খুচরো পেট্রোল বিক্রির অসংখ্য দোকান, হোগলার বেড়া ঘেরা একটি কি দুটি নামমাত্র বার, মোড়ে মোড়ে সওয়ারির অপেক্ষায় দাঁড়ানো দু- দশটি মোটরসাইকেল আর অসংখ্য হতভাগ্য মানুষ। এই হলো বুনিয়া।

প্রকৃতির দান বুঝি সব দৈন্য ছাপিয়ে যায়। লেক আলবার্ট থেকে উদ্বায়ী জলকণা আকাশের গায়ে চুমু খেয়ে বুনিয়ার বুকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে নামে প্রায় প্রতিদিনই। চারদিকে আরণ্যক প্রাচুর্য আছে। গায়ের দামাল ছেলের মতো অবাধ্য স্বাধীন বন্ধনহীন বেড়ে উঠেছে রেইন ফরেস্ট। এদিকটায় একটু কম, তবে রিমোটে, এই বন বাতাসকে আটকে রাখে গভীর মমতায়। সবুজ পাহাড়ের পাঁচিল ঘেরা এই ছোট্ট শহরতলীতে একদিনেই ষড়ঋতুর খেলা। এই মেঘ, এই বৃষ্টি, আবার মুহূর্তেই ঝলমলে রোদ। ঝলমলে কিন্তু প্রখর নয়। এই রোদ গায়ে আদরের আলতো পরশ বুলোয়।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার ফুট উঁচুতে আছি তবু কেন যে কিছুতেই নিজের মাথা উঁচু হচ্ছিল না, সে বিষয়ের আলোচনা থাক। আমরা বরং কোমল প্রকৃতির আর নির্ভার জলবায়ুর কথা বলে সময় কাটাই। এই অঞ্চলটি বিষুবীয়, তাই জলবায়ু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, প্রাকৃতিকভাবেই। বোশেখের দহন নেই এখানে। রাতের শেষটায় শরতের মৃদু শীত। এই ইতুরিতেই আছে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকা পিগমি আর বিচিত্র বর্ণের মৌন- প্রিয় ওকাপির দল। আহা, কবে হবে দেখা!

পায়ে চোট পেয়ে বিছানায় পড়ে আছি বেশ ক’দিন। অফিসে যাওয়া নেই, সারাদিন একটি কামরাতে পড়ে থাকা। কামরা তো নয়, নাটবোল্ট দিয়ে জুড়ে দেয়া ইস্পাতের ফ্রেমে প্লাস্টিকবোর্ডের পার্টিশন ঘেরা। করিমেক বলে একে। আফ্রিকার এই দেশগুলোয় জাতিসংঘের ফিল্ড মিশনগুলোতে এটাই সবচেয়ে পোক্ত ব্যবস্থা। যাঁরা আরো রিমোটে থাকেন, কোম্পানি অপারেটিং বেসগুলিতে, তাদের তো দিনের পর দিন রাত কাটাতে হয় জলপাই রঙ তাঁবুর ভেতর।

ডাক্তারের কড়া নির্দেশ, লিগামেন্ট স্প্রেইন সেরে না ওঠা পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে হবে তিন সপ্তাহ, পাক্কা বেড রেস্ট। হাঁটাহাঁটি বন্ধ। শুয়ে বসে আর কত? হাতের নাগালে আছেই তো শুধু সবেধন নীলমণি একটা আইবিএম থিঙ্কপ্যাড আর ভীষণ ধীরগতির ইন্টারনেট। যুদ্ধবিরতির কী হালহকিকত, সচক্ষে দেখে এসে অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট পাঠানোর জন্য। সে কাজটিও নেই আপাতত। পরিশ্রম নেই, তাই গভীর ঘুমও নেই রাতে।

ইনবক্সে তেমন ইম্পর্টেন্ট ইমেইল নেই। সাইন আউট করে বাইরে এসে দেখি, সাদা মেঘের ভেলায় যাচ্ছে বুড়ো চাঁদ, অন্ধকার সরিয়ে সরিয়ে, বেনোজলে ভেসে। আজ পূর্ণিমার রাত, সন্ধ্যে থেকেই মেঘমুক্ত নীল আকাশ। জ্যোৎস্না নেমেছে চৌদিকে। ভেসে যাচ্ছে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের পাঁচিল, কালচে উপত্যকা, বিস্তীর্ণ প্রান্তর। রূপকথার সেই জ্যোৎস্নাভূক পাখির মতো দেহ মেলে

দিয়ে কিছুটা জ্যোৎস্না পান করি। মোম জ্যোৎস্না মেঘের গায়ে। আরো কিছুটা সময় কাটলো চন্দ্রাহত হয়ে। বাইরে একটু একটু শীত পড়েছে। মেঘ জমছে দ্রুত। বৃষ্টি হবে নাকি? কালই তো হলো!

সব পাখি ঘরে ফেরে। আমিও ফিরি। ভাঙা পা আর অলস দেহ নিয়ে। একটু চোখটা ধরে এসেছিলো। ঘুমের ঘোর হবে হয়তো। ঝুমবৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো রাত চারটায়। পায়ের কাছে ভাঁজ করে রাখা মায়ের দেয়া কাঁথাটা গায়ের উপর টেনে নেয়ায় খুবই আরাম লাগছে। ঘুম ঘুম ভাব হচ্ছে। বুঝতে পারি, ঘুমিয়ে পড়লে আরাম চলে যাবে। জেগে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটু পড়েই শুরু হলো বৃষ্টির টাপুরটুপুর। নেট লাগানো জানালার বাইরে গাছের পাতায় পাতায়, শাখায় শাখায় বৃষ্টির গান, এলোমেলো বাতাসের আনন্দিত দোদুল দোলা। ফোমের আস্তরণ দেয়া করিমেকের প্লাস্টিকের চালে ঘোর লাগা বর্ষণের শব্দ। শজারুর কাঁটার মতো টিনের চালে বাজতে থাকা ঝমঝম শব্দ নয়, হারমোনিয়ামের নিচু রীডে বাঁধা সুর। পুষি বেড়ালের আদর নরম গায়ের মতো। কাগজ- কলম নিয়ে লিখতে বসার কোনো মানেই হয় না এখন- ঘোর কেটে যাবে। তারচে' বরং মনে মনে লিখি। অনেকক্ষণ মন লাগিয়ে নূপুরের শব্দ শুনলাম। বৃষ্টি যেন জলসা ঘরের নিপুণ নর্তকী, প্রাণমদিরায় ভরে দেয় দেহমন।

দরজা খুলে ঘরের সিঁড়িতে এসে বসলাম। বারান্দা নেই, ঘরের চাল একটু সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়া, এটুকু টিনের। বর্ষণে ভিজছে সবকিছু। শুধু ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা মানুষগুলো ছাড়া। সবকটি গাছের শাখা ও পত্রপল্লব সদ্য স্নান সেরে শুচি হয়েছে। ভিজছে সবুজ লন, দূর্বাঘাস। একটি রসিক কুনোব্যাঙ লাফাতে লাফাতে চলে গেলো, এদিক থেকে ওদিকে। এখানে না এলে, পরিমিত জলসিঞ্চনে রেইনফরেস্ট কীভাবে বেড়ে উঠে সজীব হয়ে, পুরোপুরি বুঝে ওঠা হতো না আমার। মানুষও বোধহয় এমনি, পরিমিত ভালোবাসায় নতুন করে বিকশিত হয়।

Sweetheart, do not love too long:
I loved long and long,
And grew to be out of fashion
Like an old song.
All through the years of our youth
Neither could have known
Their own thought from the other's,
We were so much at one.
But O, in a minute she changed -
O do not love too long,
Or you will grow out of fashion
Like an old song.

ভ্রমণপিপাসু মন মনভ্রমণে সময় কাটাতে পারলেও পায়ের চোট সারতে সারতে পিগমি আর ওকাপি দেখার দিন পিছিয়ে গেলো। পায়ের চোট সারলো কিন্তু তবু জুতসই মওকা মেলে না। কাজের ব্যস্ততা বাড়ে। যুদ্ধবিরতির হালহকিকত পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি নতুন দায়িত্ব আসে। ঝুঁকির প্রান্তদেশে অবস্থান নিয়ে অনেক চ্যালেঞ্জিং কাজে নিজেকে জড়াতে হয়। যে কোনো মূল্যে 'প্রটেকশন অব সিভিলিয়ান' এই হলো ম্যান্ডেট। রিফিউজি ক্যাম্পের প্রতিটি কান্না হৃদয়ের তন্ত্রীতে ভিন্নতর সুর তোলে। তবুও চালানের পর চালানে অস্ত্র আসে। নির্বোধ মানুষগুলোর হাতে শোভা পায় নতুন নতুন কালাশনিকভ। চেইনে লাগানো বুলেট- কার্তুজ- গুলি মোহরের চেয়েও প্রিয় শব্দে বেজে উঠে। দূরে উড়ে যায় বিষণ্ন পায়রাগুলি, শোনা যায় প্রেতের অট্টহাসি।

এখানে মৃত্যু হানা দেয় বার বার;

লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।

এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ স্বপ্নে সবুজ মাটি

নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি;

এখানে চরম দুঃখে কেটেছে সর্বনাশের কাল,

ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,

হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

২

অযাচিতভাবেই সুযোগটা চলে এলো। বুনিয়া বিমানবন্দর থেকে একটি রোটারি উইং উড়ে যাবে ইপুলুর উদ্দেশ্যে। রেকি মিশন। খবর পেয়েই দে ছুট।' অব পারসোনেল' সংক্ষেপে 'এম ও পি' করতে হবে, প্যাক্স লিস্টে নাম ওঠাতে হবে। বুনিয়া লজিস্টিক বেসের সুপারভাইজার অগাস্টিনের সাথে খাতিরটা এবার কাজে লাগলো। ঝটপট এম ও পি এপ্রুভ হলো। দীর্ঘদিন ধরেই বুনিয়া বিমানবন্দর পরিচালনার ভার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উপর ন্যস্ত। এয়ারক্রাফট আর পাইলটদের দেখে গর্বে বুক ভরে ওঠে আমার। এই মুক্তবিহঙ্গ আমার দেশের। উড়িয়ে নিয়ে যাবে আমার দেশের তরুণ বৈমানিক। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে রানওয়ে, টারমাক, এয়ারফিল্ড সিকিউরিটি, সবখানে আমার দেশের দৃপ্ত পদচারণা। এই বিমানেই আমার জায়গা হলো। যাত্রা শুরুর আধঘণ্টা আগে 'চেক ইন টাইম'। সময়মতো হাজির হলাম। রেকি মিশনের সদস্যগণও এসে পড়েছেন। কম্ব্যাট ইউনিফর্মে সুসজ্জিত তাঁরা। এই মিশনের নেতৃত্ব দেবেন স্বয়ং ইতুরি ব্রিগেড কমান্ডার। তিনিও বাংলাদেশী। একে একে সবাই কপ্টারের পেটে সেঁধিয়ে দিই নিজেদের। এঞ্জিনের শক্তিতে পাখাগুলি ঘুরতে শুরু করে, মাটিতে বাতাসের চাপ বাড়িয়ে সামান্য দোলা দিয়ে শূন্যে ভেসে ওঠে বিশাল আকারের পাখি। আমাদের যাত্রা হলো শুরু।

এই তবে আফ্রিকার অরণ্য, এই তবে কঙ্গো বন। এখানে বনস্পতির নিবিড় আস্তরণ, এখানে কৃপণ আলোর অন্তঃপুর। উড়ে যেতে যেতে ঘন বনের বিস্তার দেখি। ঘন কালচে সবুজের মাঝে একটুকুও ফাঁক নেই। একচিলতেও মাটিও চোখে পড়ে না। ক্যামেরাতে বার্ডস আই ভিউ ধরি। লজ্জাবতী পত্রপল্লবের মাঝ দিয়ে উরুসন্ধির সিঁথির মতো এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে অচেনা এক নদী। ছেলেবেলায় রোমাঞ্চ কাহিনিতে পড়া আফ্রিকার অরণ্যকে মেলাতে চেষ্টা করি। বাস্তবের অরণ্য কল্পনার অটবীকেও ছাড়িয়ে যায়।

এয়ার পকেটে পড়ে কপ্টার। নাগরদোলা নেমে আসার কালে তলপেটে যে ধরনের চিনচিনে অনুভূতি হয় অনেকটা সে ধরনের অনুভূতি। সেই অনুভূতির অভিব্যক্তি প্রাণপণে চেপে রাখি। মিলিশিয়াদের মেশিনগানের গুলির তোয়াক্কা না করে এবার হেলিকপ্টার বেশ নিচু দিয়ে উড়ে যায়। এ জায়গাটাতে

পোটোপোটোর গভীর জঙ্গল। চিরুনি অপারেশনেও উকুনের সন্ধান মেলা দুষ্কর। তাই রেকি মিশনকে সাফল্যের মুখ দেখাতে ভিউ পয়েন্টগুলো অপারেশন ম্যাপে আগে থেকেই চিহ্নিত করে রাখা। হেলি ল্যান্ডিং সাইট কোথায় হবে, কোথায় ফাস্ট রোপিং করে নেমে আসবে জাতিসংঘের কমান্ডো সেনারা, যুতসই ইমারজেন্সি এস্কেপ রুট কোনটি হবে, এসব নিয়েই মতবিনিময় করছিলেন সেনা কমান্ডারগণ। উৎসুক হয়ে তাদের কথা শুনি। তারপর আবার জানালার হ্যাচ তুলে দিয়ে অফুরন্ত সবুজের মাঝে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলি।

একসময় মাটিতে নেমে এলো কপ্টার। সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠের উপর। ইপুলুর সব লোক এসে জড় হয়েছে মাঠের এক কোণে। আবাল- বৃদ্ধ- বণিতা। চোখে মুখে এতটুকু স্বস্তির প্রত্যাশা। এরই মাঝে দুরন্তপনায় মত্ত হয়েছে বালকের দল, প্রবীণেরা শাসন করছেন, যুবকেরা এগিয়ে আসছেন জাতিসংঘ বাহিনীর সহায়তায়। হরেকরকম শুকনো খাবার বিলানো হলো তাদের মাঝে। মেডিক্যাল ক্যাম্প করে দেয়া হলো চিকিৎসা সেবা। শুশ্রূষায় আর্দ্র হলো প্রৌঢ়ের চোখ।

রেকি মিশন শেষ। এবার ওকাপি দেখার পালা। যাত্রা শুরু হলো ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশ্যে। পার্কটির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেখি সেটা ঘিরে রেখেছে কঙ্গোলিজ ওয়াইল্ড লাইফ অথরিটির (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN) প্রশিক্ষিত রেঞ্জারগণ। কাছেই পুরোনো একটি বাংলো। গ্যারেজে পার্ক করা রেঞ্জারদের বন দাপিয়ে বেড়ানো গাড়ি। দেয়ালে আলোকচিত্র গেঁথে গড়া একটি মনুমেন্ট। ছবিটি কার স্মরণে

সেটি স্পষ্ট হলো না। ইংরেজি কিম্বা ফ্রেঞ্চ জানা কাউকে কাছে পিঠে পেলে জিজ্ঞেস করা যাবে। কিউরেটরের সাথে পরিচিত হলাম। ওকাপি নিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন তিনি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম। হায়, স্মরিত ছবিটি স্যার হ্যারি জনস্টনের কি না সেটি জিজ্ঞেস করার কথা বিস্মৃত হলাম।

ওকাপি খুবই লাজুক প্রাণী। নিজ মুদ্রাদোষে প্রত্যহ থাকেন একা। দিনে খাবার খান না তারা। খাবার বলতে শুধুই বিশেষ কোনো এক বৃক্ষের পাতা। সারাদিন ধরে পিগমিদের কাজ হলো বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে সেই গাছের পাতা খুঁজে আনা। শুধুমাত্র পিগমিরাই চিনে সেই গাছ। ধুয়ে রাখা সেই পাতায় শেষরাতে ডিনার সারেন ওকাপি মহাশয়। ঘুরে ঘুরে আমরা সেই পাতা ধোয়ার আঞ্জাম দেখি।

এরপর দেখলাম নেটে ঘেরা নির্বাসিত নিবাস, সামনে নাম ফলক আঁটা। মহাশয়ের নামখানাও সুন্দর। কিন্তু মহাশয়ের দেখা নেই। লাজুক ভঙ্গিতে একদিক থেকে অন্যদিকে হেঁটে যেতে যেতে তিনি যখন দেখা দিলেন তখন বলতেই হলো, 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি...'। মাথাটা অনেকটা ঘোড়ার মতো। লম্বা বিনীত ঘাড়, ঠিক জিরাফের মতো অত লম্বা কিম্বা সটান উঁচু নয়। নীল রঙের জিহ্বাও কম লম্বা নয়, পৌঁছে যায় একেবারে চোখের পাতা অবধি। পেছন দিকটা দেখা গেলো সবশেষে। জেব্রার মতো। লালচে পটভূমিতে সাদা ডোরা। অন্ধকারে গন্ধ ও আলো ছড়িয়ে পথ দেখায় শাবকদের।

ইতুরির ইপুলু আর ওয়াম্বা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় ৩০০০ মুক্ত ওকাপির খাঁচায় বন্দি ১০টি জাত ভাইবোন দেখে যখন ফিরছিলাম তখন সারা নদীর ফেনিল গর্জনে যেন নতুন করে আহত আফ্রিকাকে শুনলাম। দেখলাম, প্রবীণ পিগমির সাথে কথা কইছেন একজন শান্তির দূত। শান্তির ললিত বাণী তাঁর সফল হবে কি না জানি না। রোগমুক্তি না হোক শুশ্রূষা তো হবে। সেটুকুই বা কম কীসে?

শুভ নববর্ষ